ইসলামী চিন্তার সংস্কার

বিচ্যুতি, প্রগতি, নাকি সময়ের দাবি?

ইয়াসির ক্বাদি

ইসলামী চিন্তার সংস্কার

বিচ্যুতি, প্রগতি, নাকি সময়ের দাবি?

ইসলামী চিন্তার সংস্কার

বিচ্যুতি, প্রগতি, নাকি সময়ের দাবি?

ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ
আইয়ুব আলী

অনুবাদ সম্পাদনা
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
মাসউদুল আলম

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
CSCS

ইসলামী চিন্তার সংস্কার: বিচ্যুতি, প্রগতি, নাকি সময়ের দাবি?

মূল: ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
মাসউদুল আলম

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক: সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
কার্যালয় (অস্থায়ী): এসই– ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
০১৯৫৩ ৩২৩০৩০
contact@cscsbd.com
cscsbd.com

অনুবাদ স্বত্ব: সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

মূল্য: ১৫০ টাকা মাত্র

‘Islami Chintar Songskar: Bichhoti, Progoti, Naki Somoyer Dabi?’ (Islamic Reform: Destruction, Progress or Necessity?) by Yasir Qadhi, translated by Ayub Ali, published in October 2022 by CSCS Publications, South Campus, University of Chittagong. BDT 150 only.

ভূমিকা

ইসলামী চিন্তার সংস্কার, এটি ইসলামের সংস্কার নয়। বরং ইসলাম সম্পর্কে আমাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি তথা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সংস্কার। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণার পুনর্গঠন। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে কর্মকাণ্ড, প্রচলিত ভাষায় যাকে ইসলামী আন্দোলন বলা হয়, এর খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি ইসলামী শরীয়তে বলা হয় নাই।

একদৃষ্টিতে এটি ত্রুটি। অন্যদৃষ্টিতে যে কোনো কালোত্তীর্ণ ও বৈশ্বিক মতাদর্শের এটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের পর্যায়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থা, ভূগোল ও পরিবেশ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক মান ইত্যাদি নানা বিষয় কীভাবে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রে আচরিত হবে তা নির্ধারণ করে কোনো না কোনো দ্বীন বা জীবনাদর্শ ।

এই এডজাস্টমেন্ট হতে পারে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শটির মৌলিক কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে। অথবা, হতে পারে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে। প্রথমটি আদর্শের সংস্কার। দ্বিতীয়টি আদর্শ বাস্তবায়নের কৌশল।

ইসলামী চিন্তার সংস্কার কথাটার মাধ্যমে, উপরেই বলেছি, দ্বিতীয় ধরনের কর্মপন্থার কথা বলা হচ্ছে। ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নে নানাবিধ বিবেচনা সাপেক্ষে ক্রমধারা অবলম্বন করার এই বিষয়টিকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় সুন্নাতে তাদাররুজ।

এই গ্রন্থটিতে ক্রমধারার বিস্তারিত কিছু বলা না হলেও এটি মূলত ক্রমধারা সংশ্লিষ্ট।

এটি গ্রন্থাকারে লিখিত হয়নি। এটি ড. ইয়াসির ক্বাদি কর্তৃক লন্ডনে দেয়া একটা বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ। বৃটিশ মুসলিমদের লক্ষ করে এই বক্তৃতা দেয়া হলেও এটি দুনিয়ার বাদবাকি মুসলমানদের জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশের এই উদ্যোগ।

অত্যন্ত চমৎকার এই আলোচনায় সমকালীন মুসলিম সমাজকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(১) ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ,
(২) আপসকামী বা এপলজেটিক,
(৩) রক্ষণশীল,
(৪) কট্টরপন্থী বা জিহাদী ও
(৫) সংস্কারবাদী

এরপর তিনি একে একে ধারাগুলোর অল্পবিস্তর ব্যাখা-বিশ্লেষণ করেছেন।

তৎপূর্বে, বক্তৃতার শুরুর দিকে তিনি একটা গল্প বলেছেন, সবিস্তারে। কল্পিত এক ‘ইউনাইটেড কিংডম অব ভেগানোপোলিসের গল্প’। এটি উনার একটা ইউনিক টেকনিক। মূল আলোচনা কোনদিকে যেতে পারে তা এই গল্প হতে আঁচ করা যায়।

নিজেকে তিনি সংস্কারবাদী ধারার সাথে আইডেন্টিফাই করেছেন। ইয়াসির ক্বাদি যে অর্থে এখানে রিফর্মিস্ট ট্রেন্ডকে ব্যাখ্যা করেছেন তারসাথে মোটাদাগে আমরাও একমত। যদিও সমকামিতার মতো বিষয়ে উনার কিছুটা সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সঙ্গত কারণেই আমাদের দ্বিমত আছে।

আগেই বলেছি, এটি একটি বক্তৃতা। তাই, বইয়ের মধ্যে আপনারা যেসব শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম পাবেন সেগুলো আমাদের দেয়া। আলোচনার সুবিধার্থে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পৃথক অধ্যায় হিসেবে সেগুলোকে সংযোজন করা হয়েছে।

পুরো কন্টেন্টটা যেহেতু ইয়াসির ক্বাদির তাই উনাকে লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অনুবাদকের সাথে অনুবাদ সম্পাদনাকারীদের নাম সংযোজনের কারণ হলো সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএসসিএস) কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিটি লিখিত বক্তব্যকে আমি নিজে খুব ভালোভাবে দেখে দেই। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল অনুবাদকের লেখায় এত বেশি এডিটিং করা হয়, আমাদের মনে হয়েছে, লেখায় অনুবাদ সম্পাদনাকারীদের নাম সংযোজন করা ঔচিত্যবোধের দিক থেকে শ্রেয়তর।

অনুবাদ সম্পাদনার কাজটির প্রথম পর্যায় মাসউদুল আলমের হাতে হয়ে থাকে। এই বইটির ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। আমাদের হাতে ফ্রিকোয়েন্টলি পেন-থ্রু করার কাজটিকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অনুবাদকই অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভাব্য কোনো ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য কথাটা এখানে খোলাসা করে বললাম।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
পরিচালক, সিএসসিএস
ও
স্বত্বাধিকারী, সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

এসই-১৫,
দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

সূচিপত্র

শুরুর কথা ৯
ইউনাইটেড কিংডম অব ভেগানোপোলিসের গল্প ১১
মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: ধর্মত্যাগী ধারা ১৩
আপসকামী ধারা ১৭
রক্ষণশীল ধারা ২১
কট্টরপন্থী ধারা ২৩
সংস্কারপন্থী ধারা ২৫
গল্পের সমাপ্তি ২৯
ধর্মত্যাগী ধারার বৈশিষ্ট্য ৩১
আপসকামী ধারার বৈশিষ্ট্য ৩৩
রক্ষণশীল ধারার বৈশিষ্ট্য ৩৫
সংস্কারপন্থী ধারার বৈশিষ্ট্য ৩৯
সংস্কারের দিকনির্দেশনা ৪৯
উপসংহার ৫৫
প্রশ্নোত্তর
প্রগতিবাদীদের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত? ৫৯
সমকামীদের সাথে আচরণ ৬২
কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ৬৪
যোগ্য আলেম খুঁজে পাওয়ার উপায় ৬৯
ইসলামের খেদমত করার জন্য কি আলেম হতেই হবে? ৭২
হিজাব ইস্যু ৭৫
সমাপনী বক্তব্য ৮০

শুরুর কথা

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিয়ে প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত। পাশ্চাত্যে মুসলমানরা যেসব ইস্যু মোকাবেলা করছে, সেসব মূলত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। সেটি হলো, আধুনিক লাইফস্টাইল ও আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হবে। আমি মনে করি, বিষয়টি তুচ্ছ নয়। এটি এখন আমাদের জন্য অনেক বড় ইস্যু।

আরেকটু সহজ করে বলতে গেলে, চৌদ্দশ বছরের পুরানো একটি ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক আমরা কীভাবে জীবন পরিচালনা করবো, যেখানে আমরা একবিংশ শতাব্দীর 'মানবতাবাদী' ও 'লিবারেল' মূল্যবোধসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করছি। যে কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ থেকে পাশ্চাত্যের এই সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদ্যমান ডমিন্যান্ট সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কী কী এবং কতটুকু গ্রহণ করবো, সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

এই গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেক সচেতন মুসলমানেরই চিন্তাভাবনা করা উচিত। একটি উদাহরণ দেই। অবশ্য উদাহরণটি বিতর্কিত। তাই আশা করবো, আপনারা একে ফিকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে নিছক উদাহরণ হিসেবেই দেখবেন। সম্প্রতি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া 'হ্যাপি মুসলিম ভিডিও' বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভিডিওটি হালাল নাকি হারাম, সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। এটি যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, শুধু সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি দিতে বলবো। অনেক মুসলমান ভিডিওটির ব্যাপারে তাদের বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকেই এতে কোনো সমস্যা খুঁজে পাননি।

ভিডিওটির ফিকহী বা আইনী ব্যাখ্যা আমাদের এই আলোচনার বিষয় নয়। এটি

একটি বড় সমস্যার প্রতীকী উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ, আমরা কতটুকু পর্যন্ত গ্রহণ বা বর্জন করবো, সেটি হলো মূল ব্যাপার। ভিডিওটিতে যা পারফর্ম করা হয়েছে, আমরা সবাই মিলে যদি তা করি— তাহলেই কি কাজটি হালাল কিংবা হারাম হয়ে যাবে? এটিই হচ্ছে মূল প্রশ্ন।

ইউনাইটেড কিংডম অব ভেগানোপোলিসের গল্প

একটি দীর্ঘ গল্প দিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। গল্পটির দৃশ্যপট সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এটি নিছক একটি গল্প হলেও ততটা অবাস্তব নয়। আমি যে চিত্রকল্প ও বাস্তবতা তুলে ধরবো, কয়েক দশক পর তা বাস্তবে ঘটতেও পারে। যাইহোক, গল্পটি শুরু করছি।

ইউনাইটেড কিংডম অব ভেগানোপোলিস (ইউকেভি) নামে একটি ভবিষ্যত দেশের কথা কল্পনা করি। দেশটির জনগণ নিরামিষভোজী (vegan)। প্রাণীর মাংস এবং প্রাণী থেকে উৎপাদিত যে কোনো প্রকার খাদ্য গ্রহণকে তারা বর্বরতা মনে করে। তাদের মতে, প্রাণী হত্যা একটি নিষ্ঠুর কাজ। স্রেফ মাংস, চামড়া, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য পশু লালন-পালন এবং 'হত্যা' করাকে তারা অন্যায় মনে করে।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, আক্ষরিক অর্থেই তারা নিজেদেরকে ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ বলে দাবি করে। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে– আমরা এমন এক জাতি, যারা মাংস খাওয়ার মতো আদিম প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।

এই যুক্তিটি তাদের মাঝে এক ধরনের দাম্ভিকতা তৈরি করে। ফলে তারা মাংসভোজী অন্যান্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে– তোমরা কীভাবে প্রাণী হত্যার মতো এত নিষ্ঠুর, পশ্চাৎপদ ও অসভ্য কাজ করতে পারো? জবাই করা প্রাণীর রক্তের স্রোত দেখেও তোমাদের কোনো বোধোদয় হয় না! তারপরও তোমরা কীভাবে সেই প্রাণীর মাংস খাও? এ থেকেই বুঝা যায়, তোমরা খুবই পশ্চাৎপদ ও অসভ্য একটি জাতি।

ইউকেভির বৈদেশিক নীতি

নিজেদের এই মূল্যবোধ অন্যান্য দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়াই ইউকেভির মুখ্য বৈদেশিক নীতি। এই মূল্যবোধ তাদেরকে এত বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তাদের

বন্ধুভাবাপন্ন অন্যান্য ভেজিটেরিয়ান দেশগুলোর উপরও তারা কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। ফলে তারা অন্যান্য দেশের উপর অবরোধ আরোপ করে, এমনকি আগ্রাসন পর্যন্ত চালায়। এসব কাজের পক্ষে তাদের যুক্তি হলো— আমরা এই 'পিছিয়ে পড়া' জনগোষ্ঠীর মাঝে ভেগানিজমকে ছড়িয়ে দিতে চাই। এসব দেশের জনগণ এখনো মাংস খাওয়া ছাড়তে পারেনি। অথচ আমরা নিরামিষভোজী সুসভ্য জাতি। এসব দেশের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও শুভবোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ভেগানিজমের প্রচার-প্রসারকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবে।

এক কথায়, তাদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য দেশের জনগণকে জোরপূর্বক ভেগান মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করা।

কাহিনীটি কাল্পনিক হলেও এর প্রেক্ষাপট খুব বেশি অবাস্তব নয়। কারণ, এখনই অনেকে প্রাণী অধিকার রক্ষায় সচেতন হয়ে উঠছেন। ভেগান মুভমেন্টও একইভাবে প্রসার লাভ করেছে।

প্রথম প্রজন্মের মুসলিম অভিবাসী

এবার ইউকেভির মুসলমানদের কথা ভাবা যাক। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিশর এবং টিম্বাকটুসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানরা ইউকেভিতে এসেছে। তারা সবাই জীবিকার তাগিদে শ্রমিক হিসেবে অভিবাসী হয়েছে। কিন্তু তাদের সন্তান ও নাতিপুতিরা বেশ আরামেই এখানে বসবাস করছে। তারা এখানকার অধিবাসীদের ভাষায় কথা বলে, একই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে এবং ইউকেভির সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও দর্শনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন জাগে, মুসলিম সংস্কৃতি তো নিরামিষভোজী হওয়ার কথা বলে না। যে কারণে প্রথম প্রজন্মের মুসলিম অভিবাসীরা ভেগানিজম সম্পর্কে সচেতন ছিল। তারা মাংস খেতো। যার ফলে তারা সমাজের ডমিন্যান্ট সংস্কৃতির মাঝে বিলীন হয়ে যায়নি।

তো, ইউকেভির মুসলমানদের ব্যাপারে আপনার ভাবনা কী? ভেগানিজম প্রভাবিত সমাজের ডমিন্যান্ট সংস্কৃতির ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল বলে আপনি মনে করেন?

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: ধর্মত্যাগী ধারা

কোনো মুসলিম দেশে ভেগানিজমের উৎপত্তি হয়নি। ইউকেভিতেই এর উৎপত্তি এবং সেখানে এটি খুব জনপ্রিয়। ফলে অভিবাসী মুসলমানদের জন্য এই অভিজ্ঞতা নতুন। তাই আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা।

গল্পের সুবিধার্থে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াগুলোকে আমি পাঁচটি ভাগে বিশ্লেষণ করতে চাই। অর্থাৎ ভেগানিজম ইস্যুটি নিয়ে ইউকেভিতে বসবাসকারী মুসলমানদের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রজন্ম মোটামুটিভাবে পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ দলের সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। তবে আমি শুধু প্রধান পাঁচটি ধারাকে আলোচনায় রাখছি। যথাক্রমে এই পাঁচটি ধারা হচ্ছে: (১) ধর্মত্যাগী ধারা, (২) আপসকামী ধারা, (৩) রক্ষণশীল ধারা, (৪) কট্টরপন্থী ধারা এবং (৫) সংস্কারপন্থী ধারা।

অবশ্যম্ভাবীভাবে কিছু মুসলমান ভেগানিজমের আদর্শ দ্বারা পুরোপুরি কনভিন্সড হয়ে পড়ে। তারা মনে করে, ভেগানিজমই হচ্ছে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একমাত্র লাইফস্টাইল। তারপর যখন তারা খেয়াল করে, ইসলামী ট্র্যাডিশনে প্রাণীর মাংস খাওয়ার সুস্পষ্ট বৈধতা রয়েছে, তখন পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি ও ধর্ম পুরোপুরি ত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প তারা দেখে না। কারণ, ততদিনে তারা ইউকেভির ডমিন্যান্ট সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে।

প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব

মুসলমানদের এই গ্রুপটি প্রচলিত ব্যবস্থাকে আক্ষরিক অর্থেই মন থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা ইউকেভি সমাজের মূল্যবোধ, আদর্শ ও সংস্কৃতিকে সঠিক মনে করে। তাদের ধর্ম যে এই সমাজের মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেটি তারা বুঝে। তাই তারা বলে— আমি আর মুসলমান থাকছি না। আমি নিজেকে এখানকার ডমিন্যান্ট সংস্কৃতির একজন হিসেবেই মনে করি।

পপুলিজম

তাদের অনেকে চুপিচুপি ইসলাম থেকে সরে গেছে। তারা ইসলামের শিক্ষাগুলো এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে এবং মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি হয়তো লোকমুখে তাদের ব্যাপারে শুনে থাকবেন, অমুক এখন আর ইসলামের বিধিবিধান পালন করে না। তারা এখন প্রচলিত সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে বেশ পরিচিত।

ইসলামের সমালোচনা

তারা মিডিয়াতে পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির সমালোচনা করে থাকে। এভাবে তারা ইসলামের সমালোচকে পরিণত হয়। তারা বলে— আমি মুসলমান পরিবারে জন্মেছিলাম। কিন্তু আমার পরিবারের লোকজন মাংস খায়। তাই আমি এখন আর তাদের সাথে নেই।

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত দ্রুত বিখ্যাত ও ধনী হয়ে ওঠে। ওদের বই বেস্ট সেলার হয়। টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পড়ে। এ ধরনের লোকেরা সাধারণত মিডিয়ার কাছে পোস্টার-চাইল্ড ও ডার্লিং-বয় হিসেবে খাতির পায়। কারণ, তিনি প্রচলিত সংস্কৃতিকে সঠিক হিসেবে তুলে ধরেন। একই সাথে তিনি বলে বেড়ান— আমি আমার বাপ-দাদার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেছি।

বিচ্ছিন্ন রেফারেন্স ব্যবহার

গল্পের এ পর্যায়ে দেখা যায়, এই ধরনের ব্যক্তিরা তার ফেলে আসা মুসলিম পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সমালোচনা করার মাধ্যমে প্রাচুর্য ও খ্যাতি কামিয়ে ফেলে। তারা কোরআনের সমালোচনা করে সাধারণত বলে থাকে— আমি কোরআন-সুন্নাহ পড়ে দেখেছি যে কোরআন স্পষ্টভাবেই গোশত খাওয়াকে অনুমোদন করেছে। তারপর প্রমাণ হিসেবে কোরআনের আয়াত পড়ে শোনাবে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ

“তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে।” (সূরা মায়েদা: ১)

সে কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেসব আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে। একটি সরল ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতকে পক্ষপাতদুষ্ট পূর্বানুমান থেকে প্রতীকী অর্থে পাঠ করবে। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ওই আয়াত দ্বারা আদৌ তেমন কিছু বুঝানো হয়নি। এভাবে সে একেকটি আয়াত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করতে থাকবে। যেমন,

সে বলবে— প্রাণীদেরকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে জবাই করার ব্যাপারে কোরআন উৎসাহিত করেছে। অথচ কোরআনের আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে এ রকম:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

"জবাই করার সময় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। তারপর তারা যখন ঢলে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত ও সাহায্যপ্রার্থী অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও।" (সূরা হজ: ৩৬)

কিন্তু সে এই আয়াতের অপব্যখ্যা করে বলবে— প্রাণীদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে একের পর এক জবাই করার ব্যাপারে কোরআন স্পষ্টভাবেই উৎসাহিত করেছে।

টেকনিক্যালি তার দাবিটি সঠিক। কিন্তু সে যে ধরনের নাটকীয় বর্ণনা ও অভূতপূর্ব প্রতীকী অর্থ দাঁড় করিয়েছে, আয়াতটি পাঠ করলে সে ধরনের চিন্তা পাঠকদের মনে আসে না। অথচ প্রচলিত সংস্কৃতি তার ব্যাখ্যাটাই গ্রহণ করে। তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, প্রাণীদেরকে লাইনে দাঁড় করানো এবং একসাথে জবাই করা অত্যন্ত 'বর্বর' কাজ। তারা এভাবে ভাবতেই অভ্যস্ত।

এইসব মুরতাদদের কেউ হয়তো আরো বলবে— আমি 'তাদের' নবীর জীবনী পড়েছি। ফলে আমার কাছে এটি পরিষ্কার যে তিনি নরমাংস খেতেন। তাদের অন্যতম একটি ধর্মগ্রন্থ সহীহ বুখারী থেকে জেনেছি, মোহাম্মদের প্রিয় খাবার ছিল ভেড়ার পায়ের নলি।

তারপর সে বলবে— মাংস কীভাবে ঈশ্বর প্রেরিত নবীর প্রিয় খাবার হতে পারে? এটি কীভাবে সম্ভব! তারমানে এই নবী ঈশ্বর মনোনীত ছিল না।

তারপর সে উপসংহার টানবে— ইসলাম প্রাণী হত্যাকে উৎসাহিত করে। তাদের ধর্মীয় উৎসব (যেমন: ঈদুল আজহা) মূলত প্রাণী হত্যার উৎসব। তাদের অনুষ্ঠানগুলো হাজার হাজার ভেড়া-বকরি জবাই করার উপলক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি নাকি তাদের উৎসব! আকিকা ও বিয়ের ওয়ালিমাসহ যে কোনো আনন্দঘন ঘটনায় তাদের ধর্ম তাদেরকে কী করতে বলে? বলে— যাও, গরু-ছাগল-ভেড়া জবাই করো! এদের হত্যা করো!

মনগড়া ব্যাখ্যা

সাদামাটা ব্যাপারগুলোকে এ ধরনের ব্যক্তিরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, সেভাবে আগে কেউ কখনো ভাবেনি। এর কারণ হচ্ছে সমাজের ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ বা প্রচলিত সংস্কৃতি ভেগানিজমকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এ ধরনের ব্যক্তির নিকট

ইসলামের এ জাতীয় সবকিছুই 'খারাপ' ও 'বর্বরতা' মনে হয়।

ব্যক্তিটি যদিও কোরআন-হাদীসের সঠিক উদ্ধৃতি দিচ্ছে, কিন্তু এসব উদ্ধৃতির প্রতীকী অর্থ আবিষ্কার করে এমন ভয়ঙ্কর হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, যা কোনোভাবেই আমাদের কল্পনাতেও আসেনি। এমনকি ইউনাইটেড কিংডম অব ভেগানোপোলিশে জন্মগ্রহণকারী ছাড়া অন্য কারো মাথায়ও এসব চিন্তা আসার কথা নয়।

উদ্ভট ফিকহী মতামতের উদ্ধৃতি

তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞ লোকেরা এমনসব ফিকহী মতামতের উদ্বৃতি দেয়, যেগুলো অধিকাংশ মুসলমানেরই অজানা। এইসব মতামত মুসলমানরা কখনো শোনেনি। তারা এই উদ্ভট মতামতগুলোই ফিকাহর গ্রন্থগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে। তারা সেগুলোকে হয়তো সঠিকভাবেই উদ্ধৃত করে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন মতামত এখনকার ইসলামী সমাজে প্রচলিত নেই। হয়তো হাজার বছর আগে কিছু মানুষ সেগুলো অনুসরণ করতো।

তারা এভাবে বলে— আরে! মুসলমানরা তো খুবই অসভ্য। তাদের হাম্বলী মাজহাব তো বন্য কুকুর এবং শিয়াল খাওয়া জায়েজ করেছে! গরু-ভেড়া না হয় বাদই দিলাম, তাই বলে বন্য কুকুর আর শিয়াল! তাদের মুহাদ্দিসরা মরুভূমির টিকটিকি খাওয়াকে পর্যন্ত জায়েজ মনে করে! আর মালিকী মাজহাব কি বলেছে, জানো? তারা বলেছে, তুমি চাইলে কুকুর-বেড়ালও খেতে পারো। এগুলো হারাম নয়। আর কিছু আলেম তো শুকর ছাড়া সবকিছু খাওয়া জায়েজ মনে করে। অর্থাৎ তুমি চাইলে ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি, বিচ্ছুও খেতে পারো।

মাজহাবগুলোর কোনো কোনো আলেম এগুলোকে জায়েজ মনে করেছেন— এটি সত্য। কিন্তু কয়জন এইসব মতামত জীবনে একবার হলেও শুনেছে? আর কয়জন এসব মতামত মেনে জীবনযাপন করে? কেউ নয়। অথচ তারা এ ধরনের মতামতগুলোই খুঁজে খুঁজে বের করে মিডিয়াতে প্রচার করে। তারপর এগুলোর উপর ভিত্তি করে পুরো ধর্মবিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

এ ধরনের ব্যক্তিরা ইসলামের ব্যাপারে বলে থাকে— তাদের ধর্মগ্রন্থ, নবীর জীবনী এবং ফিকাহর বইগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ইসলাম একটি বর্বর, অসভ্য এবং পশ্চাৎপদ ধর্ম। কারণ, এই ধর্ম প্রাণীহত্যার মতো ন্যক্কারজনক কাজকর্মের প্রচার করে। তাই কোনো সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান মানুষ এই ধর্মকে সত্য এবং সঠিক বলে মনে করবে না।

২। আপসকামী ধারা

এই ধারার অনুসারীরা নিজেদের ইসলামী আইডেন্টিটি টিকিয়ে রাখার জন্য নানান কৈফিয়ত দিতে থাকে। পূর্বোক্ত দলটি তাদের ইসলামী আইডেন্টিটি পরিত্যাগ করলেও এই দলটি আপসকামী। একদিকে তারা সমাজের ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ অর্থাৎ ভেগানিজমকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একমাত্র কোড অব ল মনে করে। আবার একইসাথে নিজেদেরকে তারা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়। পবিত্র কোরআন ও মহানবীর (সা.) উপর ঈমান রাখার কথা তারা প্রকাশ্যেই বলে।

কোরআন যেখানে সুস্পষ্টভাবে মাংস খাওয়ার অনুমোদন দিয়েছে, সেখানে প্রগতিবাদী আপসকামীরা মনে করে যে এটি জঘন্য, পশ্চাৎপদ এবং অসভ্য একটি কাজ! তাহলে কোরআন ও নবীর (সা.) উপর কভাবে তাদের ঈমান থাকে? তারা কি আদৌ আর মুসলমান থাকে?

হাদীস অস্বীকার

এই দলটি বিশেষ কোনো জনপ্রিয় ভাষ্য বা স্থানিক প্রথা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অবচেতনভাবে নিজেদের মূল্যবোধ পরিবর্তন করে ফেলে। এই বিকৃত আদর্শ ও মূল্যবোধ তারা কোরআন ও ইসলামী ঐতিহ্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এরা সাধারণত হাদীস প্রত্যাখ্যান করে। 'হাদীসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। তাই শুধু কোরআন নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে'— এটি হলো তাদের বক্তব্য।

মাংস নিষিদ্ধ করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য!

মাংস খাওয়ার অনুমোদন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো— এটি সত্য যে অতীতের কিছু আলেম কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোরআন মাংস খাওয়াকে উৎসাহিত করে। কিন্তু আপনি ইসলামের স্পিরিট বা শরীয়তের উদ্দেশ্যের দিকে খেয়াল করলে দেখবেন, মাংস খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাই ছিল শরীয়তের উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে

শরীয়ত তা নিষিদ্ধ করতে পারেনি। তবে শরীয়ত কিছু উপায় বাতলে দিয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে মাংস খাওয়া এক ধরনের পশ্চাৎপদতা। বর্তমানে আমরা ভেগানোপোলিস রাষ্ট্রে বসবাস করছি। তাই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের ভেগানিজম গ্রহণ করা উচিত। এটি ইসলামী আইনেরও দাবি! এ আইন মাংস খাওয়াকে হারাম গণ্য করে!

পিক অ্যান্ড চ্যুজ ফ্যালাসি

তারা আরো বলে— নবীজীর (সা.) সীরাত থেকে এটি পরিস্কার যে তিনি কদাচিৎ মাংস খেতেন।

এটি ঠিক যে মহানবী (সা.) কদাচিৎ মাংস খেতেন। কিন্তু এই দলটি তো হাদীসই অস্বীকার করে। কিন্তু নিজেদের সুবিধামতো তারা ঠিকই দুয়েকটা হাদীসকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে। একে বলা হয় পিক অ্যান্ড চ্যুজ ফ্যালাসি বা একপেশে নীতি। তারপর এই রেফারেন্সকে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে, যার সাথে মূল বিষয়ের অর্থগত সম্পর্ক নেই। যেমন তারা বলে— মহানবীর (সা.) স্ত্রী আয়েশা (রা.) বলেছেন, তাদের চুলায় তিন মাস পর্যন্ত আগুন জ্বলেনি। তারমানে, কোনো মাংসও রান্না হয়নি!

মহানবী (সা.) ভেগান ছিলেন!

এরপর তারা বলবে— এখন কেউ বলতেই পারে, এই ঘটনার মানে হলো মহানবী (সা.) ভেগান ছিলেন। আসলে ভেগান হওয়াই ছিল ইসলামের স্পিরিট। যদিও তিনি কদাচিৎ মাংস খেতেন, তবে এর পেছনে তখনকার রীতিনীতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই আদর্শ হিসেবে বা দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমাদের ভেগান হওয়াই উচিত।

উটের অভিযোগ

তারা হয়তো এমনটাও বলবে— তখনকার সমাজে নানা ধরনের প্রথা বা রীতিনীতি থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাঁকে রহমাতাল্লিল আলামীন তথা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন।

এ পর্যায়ে তারা আরেকটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কোনো বিষয় নিজেদের অনুকুলে নিতে তারা সেটির ব্যাপক অর্থের পরিবর্তে বিশেষ একটি অর্থকে গ্রহণ করে।

আমরা জানি, কোরআনে মহানবীকে (সা.) বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, হাদীসের সূত্রে একটি উট কর্তৃক তার মালিকের বিরুদ্ধে

দুর্ব্যবহার করার অভিযোগের ঘটনা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে— ‘একবার একটি উট মহানবীর (সা.) কাছে এসে অভিযোগ করলো: আমার মালিক আমাকে সাধ্যের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করায়, কিন্তু অনেক কম খাবার দেয়।’ আরেকটি হাদীসে এসেছে, উটটির অভিযোগ ছিল— ‘আমার মালিক আমাকে প্রহার করে।’ এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) উটটির মালিককে তিরস্কার করেছিলেন।

এখন আপসকামী দলটি এই উদাহরণ দেখিয়ে বলবে— যিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমত, যিনি উটকে প্রহার না করতে তার মালিককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অতিরিক্ত কাজ করাতে নিষেধ করেছিলেন; সেই দয়ালু নবী তাঁর অনুসারীদেরকে ঈদের দিন রক্তপিপাসু হতে বলবেন, পশু হত্যা করার নির্দেশ দিবেন— এমনটা আপনি কীভাবে ভাবতে পারেন! এটিই কি সেই ইসলাম, যা মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন! স্পষ্টতই এটি ভুল চিন্তা। কারণ, তিনি তো রহমাতাল্লিল আলামীন! তাই ঈদের দিন পশু জবাই করাটা ভুল কাজ। এ ধরনের কিছু ইসলামে নেই। আমরা মুসলমানরা হচ্ছি ভেগান। ইসলাম আমাদেরকে ভেগানই হতে বলে।

এই দলের কৌশল হচ্ছে কোরআন-হাদীস থেকে শুধু সেই দলীলগুলোই গ্রহণ করা, যেগুলো তাদের মানদণ্ডের সাথে খাপ খায়। কোনো বিষয়ে কোরআন প্রকৃতপক্ষে কী বলেছে, সেটি নিয়ে তাদের চিন্তা নেই। বরং নিজেদের মতামতই তারা কোরআনের উপর চাপিয়ে দেয়।

৩। রক্ষণশীল ধারা

আমাদের মসজিদগুলোর মুসল্লীদের অধিকাংশই রক্ষণশীল ধারার। দেশের প্র্যাকটিসিং মুসলমানদের বেশিরভাগই এই ধারার অনুসারী। এই দলটি পূর্বপুরুষের মাংস খাওয়ার ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে এবং একে রীতিমতো আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করে। প্রচলিত বিরুদ্ধ সংস্কৃতি মাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ গণ্য করায় এই দলের কেউ কেউ একে মুসলমান হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত বানিয়ে নিয়েছে।

ধর্মবাদিতা

তারা মনে করে, ভালো মুসলমান হতে হলে অবশ্যই মাংস খেতে হবে। কেউ ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে মাংস না খেলে তারা তাকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে। এমনকি বলে ফেলে— হায়, তোমার আত্মা তো মরে গেছে! তুমি দেখছি মাংস খাও না! তুমি তো এখন ভেগান সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছো! অথচ বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠী মাংস খেতেন!

ধর্মীয় প্রথা হিসেবে মাংস খাওয়া

পাশ্চাত্যে রক্ষণশীল ধারার মুসলমানদের নিকট মাংস খাওয়া ধর্মীয় প্রথার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও এর এত গুরুত্ব নেই। যেহেতু, তারা প্রচলিত ভেগান সংস্কৃতির বিরোধী, তাই তাদের দৃষ্টিতে মাংস খাওয়া ভালো মুসলমানের পরিচায়ক।

তাই দেখা যায়, এই ধারার মুসলমানরা যে কোনো অনুষ্ঠানে তাদের মাংস খাওয়ার অভ্যাসকে প্রতীকে পরিণত করে।

বিভিন্ন উপধারা

এই ধারার মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা যে অঞ্চল থেকে এসেছিল, তার উপর ভিত্তি করে এদের মধ্যে বিভিন্ন উপধারা তৈরি হয়। এক দল বিরিয়ানীকে প্রাধান্য দেয়, তো আরেক দলের পছন্দ শর্মা। আরেক দল এসে বলে— সেদ্ধ চাল দিয়ে ভেড়ার মাংস রান্না করতে হবে। এর ভেতর বাদাম ও কিশমিশ থাকা চাই। অন্য আরেক দলের দাবি হচ্ছে— ভেড়ার মাংস নয়, মুরগী দিয়ে এভাবে এভাবে রান্না করতে হবে।

উল্লেখ্য, ভেগানরা নিরামিষভোজী হওয়া সত্ত্বেও ইউকেভিতে মাছ খেতে কোনো বাধা নেই। এ কারণে সেখানে প্রচলিত 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' খাওয়াকে এই উপদলগুলোর কোনোটিই

বরদাশত করে না। তাদের বক্তব্য হলো— আমাদের পূর্বপুরুষরা 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' খেতো না। আমাদের বরং বিরিয়ানী খেতে হবে। আরেক গ্রুপ 'রুজদে জাজ' খেতে বলবে। অন্য আরেক গ্রুপ এসে হয়তো বলবে— না, শর্মাই খেতে হবে। কিন্তু কোনো গ্রুপই 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' খাওয়ার কথা বলবে না। কারণ, এর মানে হচ্ছে আপনি বিপথে চলে গেলেন!

এই বিশেষ বিশেষ খাবারগুলো স্ব স্ব উপধারার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে তারা পরস্পরবিরোধী হয়ে যায়। আমরা হয়তো একে তুচ্ছ বিষয় মনে করছি। কিন্তু তারা ব্যাপারটিকে অনেক বড় বানিয়ে ফেলেছে।

আপনি যদি শর্মার চেয়ে বিরিয়ানীকে প্রাধান্য দেন, তাহলে তারা আপনার সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হবে। আপনাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এমনকি এর ফলে তারা আপনার সাথে একই মসজিদে নামাজ পর্যন্ত পড়বে না! কারণ, তাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে ইসলাম পালন করেছে, তার সাথে আপনারটা মিলে না।

এভাবে রক্ষণশীল ধারার প্রতিটি উপধারাই স্ব স্ব পূর্বপুরুষের সংস্কৃতিকে আপন মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকে। এটিকেই তারা ইসলাম অনুসরণের একমাত্র পন্থা বলে মনে করে।

মাংস খাওয়া ভালো মুসলমানের পরিচয়

মাংস খাওয়াকে তারা এমনই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেছে যে এর উপর ভিত্তি করেই আপনি কতটুকু ইসলাম পালন করেন, তা মূল্যায়ন করা হয়। এটি স্পষ্ট, এই ধারাটি পপুলার কালচারের পাল্টা প্রতিক্রিয়া মাত্র। যদিও তাদের সন্তানেরা এখানেই জন্মগ্রহণ করেছে। হয়তো তারা নিজেরাও এখানে জন্মগ্রহণ করেছে। তারপরেও তাদের অনেকে নিজেদেরকে ইউনাইটেড কিংডম অব ভেগানোপোলিসের সত্যিকারের নাগরিক পর্যন্ত মনে করে না।

বুদ্বুদের ভেতর বসবাস

এই মানুষগুলো দুটি ভিন্ন জগতে বসবাস করে। তারা নিজেদের বলয়ে সামাজিক মেলামেশা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চর্চা করে। কিন্তু দৈনন্দিন কাজকর্ম, চাকরি বা শপিংয়ের জন্য বাইরে গেলে তারা আসলে ভিন্ন আরেকটা জগতে প্রবেশ করে। আক্ষরিক অর্থেই তারা যেন একটি বুদ্বুদের ভেতর বাস করছে।

জেনারেশন গ্যাপের ভয়

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, তাদের সন্তান ও নাতিপুতিদের অধিকাংশই এই বুদ্বুদের ভেতর আর থাকতে চায় না। পরবর্তী প্রজন্মের এই মনোভাব নিয়ে তারা বেশ চিন্তিত। এ কারণে তাদের মতবিনিময় সভা কিংবা মসজিদগুলোতে বৃদ্ধ মানুষদের অংশগ্রহণই বেশি।

মোটকথা, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই রক্ষণশীল ধারাকে আর মেনে নিচ্ছে না। ফলে তারা বুঝতে পারছে যে এটি একটি সমস্যা। কিন্তু এর কোনো সমাধান তাদের কাছে নেই।

৪। কট্টরপন্থী ধারা

চতুর্থ দলটিকে আমরা কট্টরপন্থী ধারা বলতে পারি। এই দলটি ক্ষুদ্র হলেও মনমানসিকতায় উগ্রপন্থী। কারণ, বৃহত্তর সমাজ সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর উপর চড়াও হতে রাষ্ট্রকে অনুমোদন দিয়েছে। ফলে ইউকেভি একচোখা বৈদেশিক নীতি ও অন্যায় যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারছে এবং ভেগানিজম ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে আক্রমণ চালাচ্ছে।

এসবের ফলে তারা এত বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে যে একপর্যায়ে তারা ভেগানবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করে। প্রচলিত সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে তারা সবজির ফার্ম ধ্বংস করে ও প্রকাশ্যে শাকসবজিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দলটি সর্বক্ষণ 'আমরা বনাম তারা' মানসিকতা দ্বারা তাড়িত হয়।

এই লোকদের কাজকর্ম প্রচার করতে মিডিয়া খুবই ভালোবাসে। না হলে আমরা হয়তো এই মানুষগুলোর কথা জানতামই না। সংবাদমাধ্যমগুলো এই ক্ষুদ্র কট্টরপন্থী দলটির কাজকর্ম প্রচার করে উচ্ছ্বাসের সাথেই বলে যে এই হচ্ছে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য।

৫। সংস্কারপন্থী ধারা

নয়া প্যারাডাইম

পঞ্চম এবং শেষ ধারাটি হচ্ছে আধুনিকতাবাদী ধারা। 'আধুনিকতাবাদী' পরিভাষাটির ব্যাপারে সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকায়, এটি ব্যবহার করার কিছু বিপদ আছে। তবুও আমি এটি ব্যবহার করতে চাই। কারণ, এরচেয়ে ভালো কোনো পরিভাষা আমার জানা নেই। আর হ্যাঁ, এই ধারাটির ব্যাপারেই আমার সবচেয়ে বেশি দরদ রয়েছে।

এটিকে সংস্কারপন্থী ধারা হিসেবে অভিহিত করা যায়। পূর্বে উল্লেখিত চারটি ধারা থেকেই এটি আলাদা। ইউকেভির প্রভাবশালী ভেগান সংস্কৃতি এবং রক্ষণশীল ধারার মুসলমান কর্তৃক ইসলামী আইনের বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যাগুলোকে সংস্কারপন্থীরা ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করতে চায়।

দুটি প্রশ্ন

সংস্কারপন্থীরা মূলত দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে:

১। কেন এবং কীভাবে ভেগানিজম এত বেশি জনপ্রিয় হয়েছে? ভেগানিজমের সবকিছুই কি খারাপ কিংবা ভালো? এখানে গ্রহণ করার মতো ভালো কী আছে এবং বর্জনীয় মন্দ দিকগুলো কী?

২। ভেগানিজম সম্পর্কে ইসলামের সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য আছে কি? নাকি এটি আধুনিক যুগের একটি ব্যাপার, যার উত্তর আমাদেরকেই খুঁজে নিতে হবে?

এই ধারার অনুসারীরা বুঝতে পেরেছে, প্রাক-আধুনিক যুগে ভেগানিজম বলতে কিছু ছিল না। সেই কারণে ইসলামের ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশনে এ ব্যাপারে কিছু বলা নেই। কারণ, অতীতের আলেমগণ কোনো ভেগান দেশে বাস করেননি। ফলে ইউকেভির মতো দেশের গতি-প্রকৃতি ও নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি মনোভাব

সংস্কারপন্থীরা আপসকামীদের মতো ইসলামী ঐতিহ্যকে খারিজ করে না। আপসকামীরা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করলেও 'চৌদ্দশ বছরের পুরনো' হওয়ার অজুহাতে ইসলামী আইনকে অগ্রাহ্য করে। এর বিপরীতে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সংস্কারপন্থীরা মনে করে— স্বভাবতই ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশনের পক্ষে আধুনিক ইস্যু নিয়ে কথা বলতে পারার কথা নয়। আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর যে ধরনের সমাধান দরকার, এটি তা পারে না। সে কারণে আমাদেরকে নতুন সমাধান বের করতে হবে। ঐতিহ্যকে বাতিল করে দিলে তো সমাধান হবে না। বরং চিরায়ত ঐতিহ্য ও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আধুনিক যুগের আলেমগণ ভেগানিজম সম্পর্কে মুসলিমদের অবস্থান নির্ণয় করবেন।

উদার মানসিকতা

সংস্কারপন্থীরা ভেগানিজমকে যাচাই করে দেখতে আগ্রহী। ভেগান হওয়ার মাঝে ভালো কোনো দিক থাকতে পারে কিনা, সেই সম্ভাবনাও তারা যাচাই করে।

ভেগান হওয়া কি অনৈসলামিক? একইসাথে ভেগান ও ভালো মুসলমান হওয়া কি সম্ভব? কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের পরিবর্তে ইউকেভিত্তে ভেগানিজম উদ্ভব হওয়ার কারণেই কি একে মন্দ বলা হচ্ছে? এর মধ্যে কি এমন কোনো ইতিবাচক দিক আছে, যা গ্রহণ করা যেতে পারে?— সংস্কারপন্থীরা এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে আগ্রহী। এ কারণে তারা অন্যান্য গ্রুপ থেকে আলাদা।

ধর্মত্যাগী ও আপসকামী ধারা দুটি আধুনিক মূল্যবোধকে প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যদিকে, রক্ষণশীল ও কট্টরপন্থী ধারা হলো প্রতিক্রিয়াশীল। তারা মনে করে, আধুনিক মূল্যবোধগুলো আদতেই খারাপ। তাই এগুলো বৈধ নাকি অবৈধ, তা যাচাই করাও অবান্তর। এগুলোর বৈধতা যাচাই করতে গেলেও তাদের দৃষ্টিতে আপনি মন্দ লোক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

উভয় পক্ষকেই প্রশ্ন করা

উল্লেখিত চারটি ধারার বিপরীতে সংস্কারপন্থীরা বলবে— উভয় পক্ষকেই প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নটা কী? আমরা প্রতিটি ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভকে প্রশ্ন করি। এ ক্ষেত্রে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ হচ্ছে ভেগানিজম। আমরা প্রগতিবাদীদের মতো কোরআন ও সুন্নাহ নিয়ে প্রশ্ন তুলি না। আমরা বরং কোরআন-সুন্নাহকে ভিত্তি ধরে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত বুঝজ্ঞান, বিশেষত রক্ষণশীল আলেমদের 'বিধিবদ্ধ ইসলাম'কে (codified Islam) প্রশ্ন করি।

টেক্সটুয়ালিটি এবং টেকনিক্যালিটি

হ্যাঁ, ইসলাম মাংস খাওয়ার পক্ষে, এটি নিশ্চিত। মুসলিম সমাজের কেউ বিরিয়ানী পছন্দ করে, আবার কেউ শর্মা পছন্দ করে— এটিও সত্য। কিন্তু ইসলাম কি আমাদেরকে বিরিয়ানী বা শর্মা খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে? এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীস কী বলে? বলাবাহুল্য, সংস্কারপন্থীদের এসব প্রশ্ন সংশ্লিষ্টদের জন্য বেশ অস্বস্তিকর।

মূলকথা হচ্ছে, সংস্কারপন্থীরা কোনো ধরনের কমপ্লেক্সে ভোগে না। ফলে 'ভেগানিজম সর্বদা ভালো' ধরনের মানসিকতাও তাদের নেই। তারা প্রতিক্রিয়াশীলও নয়, আবেগপ্রবণও নয়। তারা বরং মনে করে, কেউ মুসলিম হয়েও এক অর্থে ভেগান হতে পারে। তাকওয়ার ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

কেউ স্বেচ্ছায় মাংস না খেলে কিংবা মাংস খেতে অপছন্দ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে যে তা অন্যায় নয়, এ ব্যাপারে সকল ইসলামী স্কলার একমত। এর ভিত্তিতে কাউকে 'হীনমন্য' কিংবা 'খারাপ' মুসলমান বলা যায় না।

কোনো সীমারেখা আছে কি?

এখন কেউ যদি বলে— মাংস খাওয়া তো পশ্চাৎপদতা। আল্লাহ কীভাবে একে হালাল করলেন! কেউ যদি এমন কথা বললে সেটি নিশ্চিতভাবেই একটি ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা। আপনি এই সীমা অতিক্রম করতে পারেন না।

কিন্তু ইউকেভির কথাই ধরুন, যেখানে মাংস খাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। সেখানকার কোনো মুসলমান ভেগান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। ব্যক্তিটি জানে যে ইসলাম তাকে মাংস খাওয়ার অনুমতি দিলেও এই সমাজ তা অনুমোদন করে না। এমন পরিস্থিতিতে ভেগান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তিনি পুরোপুরি ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যেই থাকেন। তিনি কোনোভাবেই ইসলামকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন না। কারণ, আধুনিক সংস্কৃতি যেমন তাকে মাংস খাওয়ার অনুমোদন দেয় না, তেমনইভাবে ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য মাংস খাওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই।

সমন্বয়মূলক অবস্থান

ইসলামে মাংস খাওয়া হালাল— সংস্কারপন্থীরা রক্ষণশীলদের এই মতের সাথে একমত। আবার, ভেগানিজমের কিছু ভালো দিকও থাকতে পারে— প্রগতিবাদীদের এই মতের সাথেও তারা একমত। সংস্কারপন্থীরা বরং আরো বলবে— খামারে বা কসাইখানায় পশুদের সাথে যেসব আচরণ করা হয়, তা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। কোনো প্রাণীকে অন্য প্রাণীর সামনে জবাই করা উচিত নয়, প্রাণীদের সাথে খারাপ

আচরণ করা উচিত নয়, তাদেরকে আজেবাজে খাবার খাওয়ানো ঠিক নয়। প্রাণীদের ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে কিছু মূলনীতি পালন করতে বলেছে।

এসব মূলনীতির কথা বলতে থাকলেই ডমিন্যান্ট কালচার তাদেরকে ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলবে— এমন আশংকাও ঠিক নয়।

তারপর কেউ যুক্তি দিতে পারে যে মাংস কম খাওয়াই আসলে স্বাস্থ্যসম্মত। এখন তো এ ধরনের সাজেশন দেয়া হয়। এমতাবস্থায় সংস্কারপন্থীরা বলবে— আপনি কি জানেন, ইসলাম মোতাবেক আপনি নিজের ব্যাপারে যত্ন নিতে বাধ্য? তাই আমাদের মাংস কম খাওয়া উচিত। আর পশু-প্রাণীদের প্রতি মানবিক আচরণ করা উচিত। এ ধরনের কথাবার্তাকে সংস্কারপন্থীদের বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এ ধরনের অবস্থান প্রথম চারটি গ্রুপেরই বিপক্ষে যায়। ফলে কিছু মানুষ যে ভিন্ন একটি প্যারাডাইম থেকে কথা বলছে, তা স্পষ্ট। রক্ষণশীলদের মতো জনপ্রিয় না হলেও সংস্কারপন্থীরা এই পাঁচটি ধারার অন্যতম হিসেবে ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছে।

গল্পের সমাপ্তি

গল্পটি শেষ। এবার চলুন পেছনে ফেলে আসা মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হই। মাংস খাওয়া নিয়ে আলোচনা করা আমাদের মূল প্রসঙ্গ নয়। শরীয়ত আমাদের জন্য মাংস খাওয়া হালাল করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। সত্যি কথা কি, রাতের খাবারে মাংস না থাকলে আমার মনে হয় যেন টেবিলে খাবারই দেয়া হয়নি! আল্লাহর শুকরিয়া যে তিনি মাংসকে হালাল করেছেন।

যাইহোক, গল্পটি মূলত মাংস নিয়ে নয়। তাই একে হালকাভাবে নেবেন না। অবশ্য পরিস্থিতির যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তাতে করে ইউরোপের কোথাও এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করা অসম্ভব নয়, যারা ভেগানিজমকে গ্রহণ করে নেবে। তখন কিন্তু এই ইস্যুগুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠবে।

বাস্তব ইস্যু

ভবিষ্যতের কথা বাদ দিলে বলা যায়, বর্তমানে ভেগানিজম কোনো ইস্যু নয়। এখনকার ইস্যুগুলো হচ্ছে– জেন্ডার রোল, যৌনতা, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য যুগে ইসলামী আইনের প্রয়োগযোগত্যা ইত্যাদি।

সাদাকালো নয়, রঙিন

এই পাঁচটি ধারার কোনোটিই পুরোপুরি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয়। এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সবগুলো ধারার সমন্বয়ে এক ধরনের স্পেকট্রাম তৈরি হয়েছে। এ কারণে আপনি হয়তো একই সাথে একাধিক ধারায় একই ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকবেন। এটি হলো নানা রঙের সমাহার। আর তাই এই ধারাগুলোর কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্টের কথা এখন বলবো।

মুসলমানদের মধ্যে নানা মত ও পথের ধারাবাহিকতার কারণে কারো কারো মাঝে

একই সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। আবার কারো কারো মাঝে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার কিছু প্রভাবও থাকতে পারে। একজন মুসলমানের উপর এই সকল পরস্পরবিরোধী ধারার প্রভাব থাকাটাও এই স্পেকট্রামের একটি অংশ। তাছাড়া, কঠোরভাবে যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে এই ধারাগুলো নির্ধারণ করা হয়নি। যাইহোক, আমি আসলে এই গল্পটির শিক্ষনীয় দিকগুলোর উপরই জোর দিতে চাচ্ছি।

ধর্মত্যাগী ধারার বৈশিষ্ট্য

এই ধারার অনুসারীরা ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেছে। তাই এদেরকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলা হয়। তাদের কথাবার্তার উদাহরণ এমন— দেখো, কোরআন কত সেকেলে একটি বই! এটি আধুনিক যুগের উপযোগী নয়। কোরআনে দৈহিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কোরআনের আইন অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীকে পুরুষের অর্ধেক দেয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ভেগানিজমের সাথে যায়, এমন কোনো কিছু নিয়েই তাদের আপত্তি নেই। মুরতাদদের সমস্যা হলো, তারা কখনো এমনকি ভাবতেও রাজি নয় যে খোদ ভেগানিজমই একটি সাময়িক ব্যাপার হতে পারে। এটি সবসময় স্থায়ী নাও হতে পারে।

জেন্ডার রোল ইস্যু

জেন্ডার রোল এ ধরনের একটি বাস্তব উদাহরণ। জেন্ডার রোল নিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে — আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে গত ত্রিশ বছরে — যত আলোচনা হয়েছে, মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসেও তা হয়নি। সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা একই রকম হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়— এই ধারণাটি অতি সাম্প্রতিককালের। সত্য কথা হলো, ইসলাম এই ধারণাকে সমর্থন করে না।

দণ্ডবিধি

অপরাধীর শাস্তি কী হওয়া উচিত— এটি বর্তমান সময়ের খুব আলোচিত একটি বিষয়। আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞরা এটি নিয়ে বিতর্ক করে যাচ্ছেন। কথা হচ্ছে, আপনাদের রাষ্ট্র (ইউকে) মৃত্যুদণ্ডকে পশ্চাৎপদ প্রথা মনে করে। কিন্তু আমার দেশ আমেরিকার কথাই ধরুন। মাদকসহ যেসব ছোটখাটো অপরাধে আমেরিকায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, শরয়ী আইনেও এসব অপরাধের এত কঠোর শাস্তির বিধান নেই। আপনারা জানেন, শরীয়তে সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের জন্যেই কেবল মৃত্যুদণ্ডের বিধান

রয়েছে। তাই বলা যায়, মৃত্যুদণ্ডকে পশ্চাৎপদ প্রথা বলার ব্যাপারে বিশ্বজুড়ে সর্বসম্মত ঐক্যমত্য নেই।

কিন্তু মুরতাদদের সমস্যা হলো, ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ যে ভুলও হতে পারে— এই চিন্তাটাই তাদের মাথায় আসে না। দুটি কারণে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভকে তারা অকাট্য সত্য বলে ধরে নেয়: হীনমন্যতাবোধ (এটি আজকাল খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে) এবং ডমিন্যান্ট কালচার। লোকপ্রিয় ও চটকদার কথাবার্তা দ্বারা তারা এতটাই আচ্ছন্ন যে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভের বাইরে আর কোনো সত্য তাদের চোখে পড়ে না। ফলে এ ধরনের লোকেরা ধর্মত্যাগ করে। তারপর যুক্তি দেয়— দেখো, ইসলাম মৃত্যুদণ্ডের কথা বলে, নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করে। তাই আমার পক্ষে মুসলমান থাকা সম্ভব ছিল না।

সমান নয়, ন্যায়সঙ্গত বণ্টন

হ্যাঁ, উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ আইনসহ কিছু বিষয়ে ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা তা অস্বীকার করি না। আপনি যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়; তাহলে ইসলাম আপনার এই আধুনিক বুঝজ্ঞানকে খণ্ডন করতে যাবে না।

তাহলে এগুলো হলো প্রথম গ্রুপের বৈশিষ্ট্য। আমাদের সমাজে এই শ্রেণীর অনেক মানুষ আছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিখ্যাত হয়ে গেছে। তারা বই লেখে, টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপসকামী ধারার বৈশিষ্ট্য

এই ধারাকে আমরা 'আপসকামী' বলি। এরা প্রথম গ্রুপের মতো ইসলামী ঐতিহ্যকে খারিজ না বটে, তবে তাদের চর্চিত ইসলামকে 'আধুনিকতাবাদী বা প্রগতিবাদী ইসলাম' বলা যায়। মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রথম দলটির মতো তাদের সমস্যাও একই ধরনের। অর্থাৎ তারাও ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভকে প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে মেনে নেয়।

বাস্তব উদাহরণ হিসেবে যৌনতা কিংবা নারী-পুরুষর সম্পর্কের কথা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে তারা হয়তো বলবে— ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশনের কথা ভুলে যান। কোরআনে কি বলা আছে যে নারী-পুরুষের সম্মিলিত জুমার নামাজে নারীরা ইমামতি করতে পারবে না? এ ধরনের নামাজে নারীদেরকে ইমামতি করতে উৎসাহ দেয়া উচিত। অথবা তারা হয়তো বলবে— নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামী সম্পর্ক অনুমোদনযোগ্য। মসজিদগুলোর উচিত এ ধরনের সম্পর্ক অনুমোদন করা।

এ জাতীয় সম্পর্ককে যেহেতু সমাজের ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ ইচ্ছার স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা করে, তাই আপসকামী মুসলমানদের মতে— ইসলামেরও উচিত এগুলোর অনুমোদন দেয়া। ফলে তারা বলে— এ জাতীয় সম্পর্ক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোরআনে তো কিছুই বলা হয়নি। অথচ কোরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। তারাই বরং মিথ্যা দাবি করছে।

নিজেদের মূল্যবোধ কোরআনের উপর চাপিয়ে দেয়া

এক্ষেত্রেও তারা নিজেদের মূল্যবোধকে কোরআনের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। নিজেদের বিকৃত ব্যাখ্যাকে তারা নানা কৌশলে ও গায়ের জোরে কোরআনের উপর এমনভাবে চাপিয়ে দেয়, যেন তাদের কথাটা কোরআনেরই কথা। এ ধরনের লোকেরা সাধারণত হাদীসকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তবে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কোনো পরিভাষাকে সাধারণীকরণ করে ফেলতে তারা ঠিকই হাদীসের অপব্যবহার করে। যেসব হাদীস উদ্ধৃত করলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তারা শুধু সেগুলোই ব্যবহার করে।

এই গ্রুপটির জন্য আমার তেমন সহানুভূতি নেই। এরা আসলেই হীনমন্যতায় ভুগছে। এই ধারার অনুসারীরা ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। তারপরও তারা কেন নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে, তা সত্যিই বিস্ময়কর!

বাস্তবতা হলো, মুরতাদরা সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানকারী হলেও প্রগতিবাদীদের চেয়ে অধিক যুক্তিবোধ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। আমি বলছি না যে মুরতাদরা তুলনামূলকভাবে ভালো। আমি বলছি, তারা তুলনামূলকভাবে যুক্তিবোধসম্পন্ন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। যেমন মুরতাদরা বলে থাকে— ইসলাম 'ক'-বিষয়কে মেনে চলতে বলে। আমি এটি পছন্দ করি না, তাই ইসলাম ত্যাগ করেছি।

তাদের এই যুক্তিটা আপনি সহজেই ধরতে পারেন।

এবার আপসকামীদের প্রসঙ্গে আসুন। ইসলাম 'ক' বিষয়টির পক্ষে। সারাবিশ্বের আলেমরাও এ ব্যাপারে একমত। দীর্ঘদিনের পরিক্রমায় বিষয়টি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় প্রগতিবাদীদের কেউ এসে বলবে— এ ব্যাপারে আমার কাছে একটি ইউনিক ব্যাখ্যা আছে। আমি কোরআনের অন্তর্গত রহস্যের চাবিকাঠি পেয়ে গেছি। আমার কাছে কোরআনের নতুন অনুবাদ ও ফিকাহর নতুন ব্যাখ্যা রয়েছে।

এ ধরনের ব্যক্তিদের ভাবসাব এমন, যেন তিনি নতুন ঐশীবাণী নিয়ে আসা একজন নবী! এসব বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার মাধ্যমে প্রগতিবাদীরা এমনসব বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে, যেগুলোকে তারা আদতে অস্বীকার করে। তারা ফিকাহ ও হাদীসের পরোয়া করে না। কোরআন যেন তাদের সমাজের ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভকে মেনে নেয়— এই হলো তাদের চাওয়া।

সত্যি কথা হলো, উপরের দুটি গ্রুপের কোনোটির প্রতি আমার কোনো প্রকার শ্রদ্ধাবোধ নাই।

রক্ষণশীল ধারার বৈশিষ্ট্য

এবার তৃতীয় অর্থাৎ রক্ষণশীল ধারা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ভেগানিজমের গল্পে এই গ্রুপটি মাংস খাওয়াকে ইসলামের 'বিধিবদ্ধ' ব্যাপার ও ধর্মীয় রীতি বানিয়ে ফেলেছিল, যা আদতে ইসলাম বলেনি। এই গ্রুপে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে।

সত্যি বলতে কি, এই দলটি মোটাদাগে ইসলামী আন্দোলনধর্মী বই এবং এই দেশের মসজিদ লাইব্রেরির বইয়ের পাঠক। এটিই হচ্ছে বাস্তবতা। আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এ কথা বলছি। তাদেরকে কোনোভাবে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

ভবিষ্যৎ নিয়ে রক্ষণশীলদের ভীতি

মোটাদাগে রক্ষণশীল ধারার বাস্তবতা হলো— দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার প্রচণ্ড ভীতি তাদের মাঝে কাজ করে। হ্যাঁ, নীতিগতভাবে সবারই এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়াটি কী? ইসলামের যে ব্যাখ্যা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলে প্রচলিত এবং যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তারা বেড়ে ওঠেছে, তাকেই তারা একমাত্র সঠিক ইসলাম মনে করে। এই ধারাটি বেশ জনপ্রিয়। কারণ, প্রতিকূল এই সমাজে তাদেরই প্রথম আগমন ঘটেছে।

স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিধান

বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বিরিয়ানী খুব জনপ্রিয় খাবার। একইভাবে শর্মাও জনপ্রিয়। উভয় খাবারেই মাংস থাকায় ওইসব অঞ্চলের মুসলমানরা মাংস খেয়ে অভ্যস্ত। অতএব, খাবার দুটি এই দেশে প্রচলন করার পর তারা ভাবে, এটি বুঝি ইসলামেরই একটি প্রতীক। এভাবে তারা কোনো মুসলিম অঞ্চলের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে আসে এবং একে ইসলামের অন্যতম বিষয় মনে করে তা অনুসরণ করে।

কেউ বিরিয়ানী বা শর্মা খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়

যেন ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, তারা পূর্বপুরুষদের থেকে যা পেয়েছে তাকেই সত্যিকার অর্থে ইসলামের অংশ মনে করে। হ্যাঁ, এর কিছু ভালো দিক রয়েছে বটে। কারণ, বিশ্বের প্রচুর মানুষ এ ধরনের খাবার খায়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও সাধারণত এসব খাবার প্রচলিত। তাই যখনই আপনি এ ধরনের রক্ষণশীল কোনো ধারায় যোগ দিবেন, তখন মনে হবে যেন বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশে এ ধরনের ইসলামই রয়েছে।

কিন্তু নিছক ভীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে উদ্ভূত রক্ষণশীলদের কার্যকলাপের ফলে কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের অনেকে ইসলাম পালন করাকে অনেক কঠিন মনে করছে। কোরআন ও সুন্নাহ কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্যের কথা বলেনি। অথচ এখানে ইসলামের নামে বাধ্যতামূলকভাবে এ ধরনের খাদ্যাভ্যাস প্রচলিত থাকায় তরুণ প্রজন্মের জন্য তা মানা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এই ইসলাম কোরআন-হাদীস থেকে উৎসারিত নয়। ইউকেভিতে বসবাসরত মুসলমানদের আচরিত সংস্কৃতি থেকে এর উদ্ভব হয়েছে।

বিরিয়ানী খাওয়া কোনো বিশেষ সময়, স্থান ও সংস্কৃতিতে জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এর মধ্যে ইসলামের কিছুই নেই। ফলে ইউকেভির কোনো মুসলমান 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' খেলে কাফের হয়ে যাবে না। যদিও এটি ইউকেভির জনপ্রিয় খাবার। বিরিয়ানী ও 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' খাবার দুটির কোনোটিরই বিশেষ কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমানরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি।

ড্রেস কোড

বিরিয়ানী এবং 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' কিছু ক্ষেত্রে ইস্যু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে এটি মূল ইস্যু নয়। বাস্তব ইস্যু হতে পারে পোশাক। পোশাক কীভাবে পরা উচিত? আলেমগণ কী ধরনের পোশাক পরবেন? রক্ষণশীল ধারায় আলেমদের পোশাককে খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়।

বাস্তবতা হলো— আমাদের আলেমদের সবাই কোনো নির্দিষ্ট সময়ের এবং বিশেষ কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রথা ও ইসলামী নীতিমালার সমন্বয়ে তৈরি পোশাক পরিধান করেছেন। পরবর্তী কালে এটিই তাদের ধার্মিকতার পরিচায়ক হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

তাই রক্ষণশীলদের কাছে গেলে আপনার সাদা শাল-কোর্তা পরিধান করা উচিত। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ ধরনের পোশাক না পরলে আপনি তাদের মসজিদে খুতবা দিতে পারবেন না। একইভাবে, অন্য কোনো রক্ষণশীল অঞ্চলে গেলে

আপনাকে 'সাওব' পরিধান করতে হবে। আবার, তাদের আরেক গ্রুপ আপনাকে 'জালাবিয়্যাহ' পরতে বলবে। এভাবে চলতেই থাকবে। কারণ, তারা কেবল নিজেদের ন্যারেটিভের সাথেই অভ্যস্ত। তাই ভিন্ন ধরনের পোশাকে তাদের নিকট কেউ যাওয়া মানেই তিনি নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যাত হবেন। তারা শুরুতেই ধরে নিবে যে আপনি আলেম সমাজের কেউ নন। কারণ, তাদের আলেম সমাজে তারা কাউকে এ ধরনের পোশাকে দেখেনি।

স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে নেয়াই সুন্নতের আদর্শ

পোশাকের সুন্নত নিয়ে বাস্তবসম্মত কথা হলো, শরীয়তের আওতার মধ্যে থেকে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে যতটুকু সম্ভব মানিয়ে নিয়ে পোশাক পরিধান করা উচিত। এটি শুধু আমার মতামত নয়। ইমাম ইবনে কাইয়ুমসহ অনেক আলেম এই মত দিয়েছেন।

ফ্যাশন বিপ্লব করার জন্য মোহাম্মদ (সা.) আসেননি। আবু জাহেল, উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফসহ মক্কার মুশরিকরা যে ধরনের পোশাক পরতো, আল্লাহর রাসূল (সা.) ঠিক সেই ধরনের পোশাকই পরতেন। কারণ, তাঁর সময়ে সেগুলোই ছিল প্রচলিত সংস্কৃতি।

অতএব, পোশাকের ক্ষেত্রে কেউ একটি বিশেষ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে পারে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এমন অনেক ধরনের কাপড় রয়েছে, যেগুলো মহানবী (সা.) কখনোই দেখেননি। এরমধ্যে 'সাওব'ও রয়েছে। অথচ একে আমরা সুন্নতের খুব কাছাকাছি মনে করি। অবশ্য এটি খুব চমৎকার পোশাক। এতে জাঁকজমকপূর্ণ বিভিন্ন উপাদান ও সুন্দর বোতাম লাগানো থাকে এবং এটি নিঁখুতভাবে তৈরি একটি পোশাক।

তবে আপনি যদি সত্যিই সুন্নত অনুসরণ করতে চান, তাহলে খসখসে ভেড়ার চামড়া জোগাড় করে পোশাক বানাতে পারেন। এই পোশাক কোনোভাবেই নিখুঁত হয় না। এটি হচ্ছে সুন্নত। তবে এটি সেই সুন্নত নয়, যা আমাদের অনুসরণ করা রাসূলের (সা.) কাম্য ছিল। আমাদের মহানবী (সা.) কখনোই বলেননি যে এই ধরনের পোশাক পরিধান করো।

ব্রিটিশ হিজাব

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে মুসলিম বোনদের হিজাব। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার নারীরা যুগ যুগ ধরে যেভাবে হিজাব পরিধান করে আসছেন, নাইজেরীয় বোনদের পদ্ধতি থেকে তা বেশ আলাদা। আবার, নাইজেরীয় নারীদের হিজাব মরোক্কান ও

সৌদি বোনদের হিজাব থেকে আলাদা। আফগান বোনদের হিজাব আবার ভিন্নরকম।

তাই আমরা যদি সৌদি আরবের হিজাবকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করি, তাহলে ভুল হবে। বৃটিশ হিজাবের যে ধারা গড়ে ওঠছে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই— নাইজেরীয় বোনদের জন্য নাইজেরীয় হিজাব, একইভাবে ইন্দোনেশীয়, মরোক্কান, পাকিস্তানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের বোনদের জন্য যদি স্ব স্ব সংস্কৃতির হিজাব পরিধান হালাল হয়; তাহলে অন্য আরেকটি সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডের মুসলমানরা ইসলামের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভেতরে থেকে একই কাজ করলে, সেটি হারাম হবে কেন?

এখানেই সংস্কারপন্থী এবং রক্ষণশীল ধারার মধ্যে পার্থক্য। হ্যাঁ, রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যেও অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে মুসলমানদের সিম্বল হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাওয়া পোশাকগুলো (কোর্তা, সাওব ইত্যাদি) সাধারণত তারাই পরিধান করে। তাই এসব পোশাকে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যদিও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) আমাদেরকে যে দ্বীন অনুসরণ করতে বলেছেন, এগুলো তার অপরিহার্য বিষয় নয়।

[ইয়াসির ক্বাদি তাঁর লেকচারে কট্টরপন্থী ধারার পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ধারাগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের এই পর্যায়ে এসে তিনি এই ধারাটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেননি।
— অনুবাদ সম্পাদক]

সংস্কারপন্থী ধারার বৈশিষ্ট্য

এবার আসুন সংস্কারপন্থী ধারা নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। সংস্কারপন্থীরা ঐতিহ্যের প্রতিও সহানুভূতিশীল, আবার ডমিন্যান্ট কালচার নিয়েও তাদের মাঝে হীনমন্যতা নেই। তারা ভালো করেই জানে, ভেগানিজম একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। বছর বিশেক আগে ভেগানিজম যেভাবে চালু হয়েছিল, তেমনি বছর বিশেক পর হয়তো এর আকর্ষণ ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া ইউকেভি রাষ্ট্র ভেগান হওয়ার কারণেই ভেগানিজম এবং এর সকল উপাদান বাতিল বলেও তারা মনে করে না। ভেগানিজমের মাঝেও ভালো কিছু থাকতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ভেগান ছিলেন না বলেই ভেগানিজম খারাপ— ব্যাপারটা তা নয়।

ভেগানিজম ও ইসলামের মাঝে সমন্বয়

সংস্কারপন্থীদের মতে, আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বেশি পরিমাণ ফলমূল ও শাকসবজি থাকা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। মাংস কম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। প্রাণীদেরকে যথাযথভাবে প্রতিপালন ও যত্ন করা আমাদের কর্তব্য। আর জবাই করার সময়ে মানবিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে আমাদের ধর্মের নির্দেশ রয়েছে।

সত্যি কথা হলো, সংস্কারপন্থীরা ভেগানিজমের কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করে। যদিও সেগুলো তাদের পূর্বপুরুষরা বিবেচনা করেনি এবং প্রচলিত ঐতিহ্যেও সেসব অনুপস্থিত। এসব ব্যাপারে তাদের মত হচ্ছে— ভেগানিজমের ইতিবাচক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা

হিজাব ইস্যুটি এখানে আবারো প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা যেতে পারে। সংস্কারপন্থীরা ব্যক্তির প্রতিটি কাজকর্ম, রক্ষণশীলদের পালিত প্রতিটি রীতিনীতিকে সেগুলোর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিবেচনা করে। কোর্তা পরিধান করা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় কেন? কারণ, এর একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত

ভারতে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত বিদ্রোহে সেখানকার মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তির পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদের স্টাইল থেকেই বুঝা যেত তিনি ব্রিটিশবিরোধী নাকি তাদের সমর্থক। একইভাবে, 'সাওব' কেন আপনার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পোশাক? এর পেছনের কারণটা সংস্কারপন্থীরা তুলে ধরে।

এভাবে সংস্কারপন্থীরা প্রতিটি কাজকর্ম ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধরে। বলাবাহুল্য, সংস্কারপন্থীরা সবচেয়ে কম জনপ্রিয়। কেননা, অপরাপর সকল পক্ষই তাদের ব্যাপারে সমালোচনামুখর।

সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

রক্ষণশীলরা সংস্কারপন্থাকে সমস্যাজনক মনে করে। কারণ, রক্ষণশীলদের ঐতিহ্যচেতনা মোতাবেক, সংস্কারপন্থীরা ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট অনুগত নয়। বিরিয়ানীর সমালোচনা করলে তারা একে সুন্নতের সমালোচনা হিসেবে বিবেচনা করে। একই কথা সাওব কিংবা কোর্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার মতে, এটি সুন্নাহবিরোধী। কেউ লন্ডনের মতো শহরে সালোয়ার-কামিজ পরিধান করাকে অধিক ইসলামী রীতি মনে করলে তা হবে সুন্নতের খেলাফ। তবে নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে এ ধরনের পোশাক পরিধান করা নিশ্চয় অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু একে ইসলামের নির্দেশ মনে করাটা ঠিক নয়। সাওব বা কোর্তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলোতে ইসলাম খুঁজতে যাওয়া একগুঁয়েমি ছাড়া কিছুই নয়।

মহানবীর (সা.) রীতি

আমাদের মহানবী (সা.) যতটা সম্ভব স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতেন। যেমন: ভিন্ন অঞ্চলের কোনো মেহমান মহানবীর (সা.) সাথে দেখা করতে আসলে, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, 'তিনি ইয়েমেনী শাল পরিধান করতেন।' সপ্তম শতাব্দীতে তাকে কে বলে দিয়েছিল বিশেষ উপলক্ষ্যে ইয়েমেনী শাল পরিধান করতে? এটি কি তাঁর নিজের আবিষ্কার ছিলো নাকি তখনকার প্রচলিত রীতি ছিলো? হ্যাঁ, তখন ভালো পোশাকে সজ্জিত হওয়ার মানে ছিল চমৎকার ইয়েমেনী শাল পরিধান করা।

স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে চলা

আমাদের সময়ে ইয়েমেনী শাল নয়, স্যুট পরিধান করাই হচ্ছে প্রচলিত রীতি। মহানবী (সা.) যখন বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে দাওয়াত দিতেন, তখন তাঁর সময়ের প্রচলিত উৎকৃষ্ট পোশাকই পরিধান করতেন। তাহলে আমাদের দাওয়াতী কাজের অবস্থা কী? আমরা এসব ক্ষেত্রে কী করি?

আপনি যখন সমাজের লোকদের চেয়ে ভিন্ন পোশাক পরিধান করবেন এবং ভিন্নতর ধর্মীয় বক্তব্য নিয়ে তাদের কাছে যাবেন, তখন প্রত্যাখ্যাত হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। অথচ আপনি তো তাদের সাথে কথা বলেন একই ভাষায়! আল্লাহ তায়ালা কেন প্রত্যেক নবীকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় বাণী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? আপনি যখন একই রকম পোশাক পরবেন, তখনই কেবল ওই সমাজের একজন হিসেবে বিবেচিত হবেন।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

“সে বললো, হে আমার জাতি! তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আমি যদি আমার মালিকের পাঠানো একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তারপর তিনি যদি আমাকে তাঁর বিশেষ রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও যদি তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে তোমরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমি কি তা তোমার উপর চাপিয়ে দিতে পারি?” (সূরা হুদ: ২৮)

সমাজের লোকেরা যাকে পরিচিত ও আপন মনে করে, তিনি যদি ভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বক্তব্য দিলেও তারা ততটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে না। এটিই হলো ইসলামের লক্ষ্য। তাই আমি বলি— অমুসলিম শ্রোতাদের সামনে কথা বলার সময় আলেমদের উচিত যুগের প্রচলিত মানদণ্ড অনুযায়ী পোশাক পরিধান করা। তবে অনেকেই এর সমালোচনা করে বলবে— লোকটাকে দেখো, আলেম হয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে আছে। এ কোন ধরনের আলেম!

টুপি পরিধান

আমি সাধারণত টুপি পরি না। যদিও হজের পর থেকে আমার মাথা কামানো। এ ব্যাপারে আমার বিনম্র মত হচ্ছে, মাথা ঢেকে রাখা পুরোপুরিই সাংস্কৃতিক একটি ব্যাপার। হ্যাঁ, আমাদের মহানবী (সা.) মাথা ঢাকতেন। কিন্তু তিনি কখনোই কাউকে এটি করার জন্য নির্দেশ দেননি। তিনি এটি করতে বলেছেন বলে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস নেই। মাথা ঢাকা ছিল তখনকার সামাজিক প্রথা। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই তখন মাথা ঢাকতো। শতাধিক বছর আগে ইংল্যান্ড-আমেরিকার লোকজনও তো মাথা ঢাকতো। লোকজনের এই অভ্যাসটি নিছক সাংস্কৃতিক ব্যাপার। আপনি চাইলে মাথা ঢাকতেই পারেন। কিন্তু একে ইসলামী রীতি মনে করলে এই দেশে তা অহেতুক জটিলতা তৈরি করবে বলে আমার মনে হয়। নিজের দেশ (অর্থাৎ যেখানে এটি প্রচলিত) হলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

স্লিপারি স্লোপ আর্গুমেন্ট

রক্ষণশীলরা সংস্কারপন্থার ব্যাপারে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত। তাদের দৃষ্টিতে, সংস্কারপন্থীরাই আধুনিকতাপন্থী ও প্রগতিবাদীদের উত্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। স্যুট-টাই পরার অনুমোদন দেয়ার পর কী অনুমোদন দেবেন? সমকামী বিবাহ?— রক্ষণশীলরা এভাবে স্যুট-টাই থেকে একলাফে সমকামী বিবাহ ইস্যুতে চলে যায়। এটি রক্ষণশীলদের এক ধরনের ভীতি। আমাকে এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

নিতান্তই সাংস্কৃতিক— এমন অনেক রীতিনীতিকে রক্ষণশীলরা হারাম সাব্যস্ত করে। আপনি যদি যুক্তি সহকারে এগুলোকে হালাল বলেন, তাহলে তাদের গড়ে তোলা ইসলাম ভেঙে পড়ে। ফলে স্বভাবতই এটি তাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

‘ও আল্লাহ! এরপর আর কী দেখার বাকি আছে! কোত্থেকে আপনি এইসব কথা বলছেন?’— তারা সবসময় এ জাতীয় অজানা ভয়ে কুঁকড়ে থাকে।

নতুন প্যারাডাইমের প্রয়োজন কেন?

রক্ষণশীলদের একটি শক্তিশালী প্যারাডাইম রয়েছে। সেটি হচ্ছে ইসলামের মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়া। একইভাবে প্রগতিশীলদেরও নিজস্ব শক্তিশালী প্যারাডাইম আছে। যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডমিন্যান্ট পশ্চিমা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা। এর বিপরীতে, সংস্কারপন্থীরা একটি নতুন প্যারাডাইম গড়ে তুলছে, যা অন্যদের কাছে আশংকার ব্যাপার। সংস্কারপন্থীদের হারানোর কিছু নেই। তারা নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি তথা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় রেখে একটি নতুন মডেল গড়ে তুলছে।

এর ফলে স্বভাবতই রক্ষণশীলরা সংস্কারপন্থীদের প্রচুর সমালোচনা করছে। প্রগতিবাদীরাও তাদের বিরোধিতা করে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে সংস্কারপন্থীরা যথেষ্ট প্রগতিশীল নয়, তারা তো শেষ পর্যন্ত কোরআন-সুন্নাহর উপরই অটল থাকে।

ওমর সিরিজ নিয়ে বিতর্ক

পোশাক থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে এতক্ষণ উদাহরণ দিয়েছি। ইস্যুগুলো নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে হয়তো আরো বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাবো। এখন একটি সহজ উদাহরণ দেবো। রক্ষণশীলদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তারা এই ব্যাপারটি নিয়ে ভুল বুঝেছেন বলে আমার ধারণা। আমাদের সার্কেলে গত বছর এটি বোধহয় সবচেয়ে বেশি কৌতুহলের বিষয় ছিল।

বিষয়টি হলো, ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) জীবনীর উপর মিডলইস্ট ব্রডকাস্টিং

করপোরেশন (এমবিসি) একটি সিরিজ নির্মাণ করেছে। বিশ্বের একদল প্রাজ্ঞ আলেমের নির্দেশনা অনুসারেই ত্রিশ পর্বের এই সিরিজটি নির্মাণ করা হয়েছে। আমার জানা মতে, মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ স্যাটেলাইট প্রতিষ্ঠান এমবিসি এই প্রথম কোনো বিষয়ে খ্যাতিমান আলেমদের সাথে যোগাযোগ করেছে। এদের মধ্যে শায়খ সালমান আল আওদা, আলী সাল্লাবীসহ বিখ্যাত আলেম ও ইতিহাসবিদগণ রয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এই ব্যক্তিগণ সিরিজটির প্রতিটি সংলাপ ও ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখেছেন। ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) জীবনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে তারা কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে।

তারপর সিরিজটি যখন সবার জন্য উন্মুক্ত করা হলো, তখন বিশ্বের প্রতিটি রক্ষণশীল ক্যাম্পের আলেমগণ এর বিরোধিতা শুরু করলেন। সালাফী থেকে শুরু করে দেওবন্দী, এমনকি সুফীরা পর্যন্ত এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। কোনো বিষয়ে আল আজহার এবং সৌদি আলেমদের একমত হওয়া বিরল ঘটনা। কিন্তু এই সিরিজের বিরোধিতায় তারা সবাই একমত! তাদের কথা হলো— আপনি সাহাবীদের চিত্রায়ণ করতে পারেন না। এটি হারাম।

তারা হারাম বিষয়গুলোর একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। অথচ তালিকাটির অধিকাংশ বিষয়ই আসলে হালাল। তারা কত সহজেই একটি তালিকা দিয়ে দিলেন! তাদের প্রতি আমার করুণা হয়। এই সিরিজের ব্যাপারে তাদের সমালোচনা হলো— কেউ কখনো যা করেনি, আপনি কীভাবে তা করতে পারেন? আপনি তো সাহাবীদের অনুকরণ করেছেন!

গঠনমূলক চলচ্চিত্র ঈমানকে মজবুত করে

এখানে উপস্থিত সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, ওমর সিরিজের কিছু পর্ব দেখে আপনি না কেঁদে পারবেন না। এতে অবশ্যই আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আমি নিজে একজন সীরাত বিশেষজ্ঞ। তাই সিরিজটি দেখার সময় আগে থেকেই সংলাপগুলো অনুমান করতে পারছিলাম। বার বার থামিয়ে পেছনের ডায়ালগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার স্ত্রী অবশ্য এতে বিরক্ত হচ্ছিলো। সে টানা দেখে যেতে চাচ্ছিলো। ডায়ালগগুলো জানা থাকায় সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে বার বার ইমোশনাল হয়ে পড়ছিলাম। আমি কেঁদেছি। আমার ঈমান অনেক মজবুত হয়েছে। ভাবতে পারেন, সাধারণ মুসলমানরা এই সিরিজের প্রতিটি পর্ব দেখছে! একেকটি পর্ব বেরুচ্ছে আর লোকজন সিনেমা হলের দিকে ছুটছে!

এমন কেউ কি আছেন, যিনি 'ব্যাটমান', 'রিটার্ন অব দ্যা ডার্ক এজেস' কিংবা 'লর্ড অব দ্যা রিংস' দেখেননি? আমার পয়েন্ট হচ্ছে সেটাই। এগুলো এখন আমাদের

সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। বাস্তবতা হচ্ছে, উম্মাহর ৯৯ শতাংশ মানুষ পর্দায় আপত্তিকর কিছু না কিছু দেখছে। অথচ তারা ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) জীবনী পড়ছে না। এই যখন অবস্থা, তখন সংস্কারপন্থীরা এগিয়ে এসে বলে— ভাইয়েরা, এই মানুষগুলোর কল্যাণের জন্যই ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) জীবনীর উপর একটি ধারাবাহিক মুভি তৈরি করা প্রয়োজন।

চিত্রায়ণের মাত্রা

তবে সংস্কারপন্থীদেরকে অবশ্যই একটি সীমারেখা মেনে কাজ করতে হবে। আমার মতে, এই সীমারেখা হলো মহানবীকে (সা.) প্রত্যক্ষভাবে কোথাও চিত্রায়িত না করা। এই সীমারেখা আমরা কোনোভাবেই লঙ্ঘন করতে পারি না। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'শয়তান আমার চেহারা অনুকরণ করতে পারবে না।' এই হাদীসের মর্মার্থ হলো— যে কারো জন্যই মহানবীর (সা.) চেহারা অনুকরণ করা হারাম। তাই কোনো অভিনেতাই আমাদের মহানবীর (সা.) চরিত্রে অভিনয় করে না। আমার মতে, এটিই হলো সীমারেখা। ওমর সিরিজে যেহেতু মাত্রা অতিক্রম করা হচ্ছে না, তাই বলা যায়, এটি অনুমোদনযোগ্য। এটি একটি ভালো মুভি।

সময়ের প্রয়োজন

ওমর সিরিজের সবকিছুই যে অকাট্য, তা বলছি না। আমার কথা হচ্ছে, এটি মন্দের ভালো। কারো এক ছটাক কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তিনি বিষয়টি বুঝতে পারবেন। লোকজনকে তাহাজ্জুদের নামাজের পরিবর্তে ওমর সিরিজ দেখতে উৎসাহিত করা হচ্ছে না। আপনার সামনে দুটি অপশন আছে। ড্রামা ফিল্ম 'সিটিজেন কেইন' এবং ওমর সিরিজ। কোনটা দেখবেন? কোনটা দেখা আপনার জন্য উপকারী? এই পরিস্থিতিতে সংস্কারপন্থীদের কথা হলো— আমাদেরকে বর্তমান যুগের কথা বিবেচনা করতে হবে। মহানবী (সা.) হাসান বিন সাবিতের (রা.) কবিতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর সময়টা ছিল কাব্যের। আমাদের সময়টা হচ্ছে মিডিয়া ও সিনেমার।

কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে

এক অর্থে, ইসলাম কাব্যচর্চাকে উৎসাহিত করে না। কোরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

"বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে।" (আশ শোয়ারা: ২২৪)

সর্বদা কাব্যচর্চা ভালো কিছু নয়। কিন্তু সমাজে এর প্রচলন থাকায় গঠনমূলক কাব্যচর্চা

ও প্রচার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

"তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।" (আশ শোয়ারা: ২২৭)

ইসলামের সাংস্কৃতিক বোধ

ইসলামকে পরিবর্তন করা সংস্কারপন্থীদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলামের বুঝাপড়াকে তারা গুরুত্ব দেয়। আমরা কখনোই সাহাবীদেরকে নাট্যমঞ্চ কিংবা মুভিতে চিত্রায়িত করিনি। এমন কোনো নাটক-সিনেমা করা হয়নি, যেখানে আবু বকর (রা.) বা ওমরকে (রা.) সরাসরি চিত্রায়িত করা হয়েছে। কিন্তু কোরআন-হাদীসে কি এ ব্যাপারে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আছে? না, নেই।

ইতিবাচক ফলাফলের জন্য পরিবর্তনকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থীরা বেশ উদার মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। কিছু ছোটখাটো বিষয় বাদ দিলে এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। আমার সোজা কথা হলো, ছোটবেলা থেকেই আমরা কিছু ব্যাপারে শুনে আসছি যে এগুলো হচ্ছে হারাম, হারাম, হারাম। অথচ সেগুলোর কোনোটাই হারাম নয়!

বার্ষিকী পালন

এ সংক্রান্ত সহজ একটি উদাহরণ হলো জন্মদিন বা বিভিন্ন বার্ষিকী উদযাপন। এসবের কোনোটাই ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। বরং ইসলাম বিভিন্ন বার্ষিকী পালনকে উৎসাহিত করে। কারণ, যেসব কাজ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা বাড়িয়ে দেয়, এমন সবকিছুকেই ইসলাম উৎসাহ দেয়। আমাদের বাপ-দাদারা বিবাহ বার্ষিকী ও জন্মদিন পালন করেনি বলেই আমাদের জন্য তা অনৈসলামী হয়ে যাবে না। প্রকৃতিগতভাবেও এগুলোতে অনৈসলামী কোনো উপাদান নেই।

কারো কারো অভিযাগ— এগুলো পালন করার মাধ্যমে লোকজন বিধর্মীদের রীতি অনুকরণ করছে, এগুলো এক ধরনের ডমিন্যান্ট কালচারাল ন্যারেটিভ ইত্যাদি। তবে এটি ফিকাহর অনেকগুলো ব্যাখ্যার একটি ব্যাখ্যা মাত্র। কিন্তু অন্যদের মতে, এই ধরনের অনুষ্ঠান উদযাপন ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। অন্য কোথাও এ প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত ফিকহী আলোচনা করবো।

হ্যাঁ, বড়দিন বা দিওয়ালি অন্যদের ধর্মীয় উৎসব। আমরা সেগুলোর অনুকরণ করতে

পারি না। কারণ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব আমাদের জন্য হারাম। আমাদের নিজস্ব উৎসব রয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া যে কোনো উৎসব উদযাপনের ক্ষেত্রে শরীয়ত সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেনি। এসব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের কার্যকলাপ হালাল হয়ে থাকলে অনুষ্ঠানটিও হালাল হিসেবে গণ্য হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে কেউ পার্টির আয়োজন করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কি হারাম? না। আপনি চাইলে কোনো বার্ষিক অনুষ্ঠান বা যে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন। এ ধরনের কোনো উদযাপন সম্পর্কে শরীয়ত সরাসরি হ্যাঁ বা না জাতীয় কিছু বলে না।

সমকামিতার ইস্যু

আরেকটি ইস্যু নিয়ে এখন বলবো। এটি বেশ বিতর্কিত একটি বিষয়। তবে এই আলোচনা আমাদের মধ্যে ভাবনার খোরাক জোগাবে। আপনারা আমার সাথে একমত হোন বা না হোন, আগে আলোচনাটা শুরু করা যাক। সমকামী সম্পর্কের ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান কী হওয়া উচিত— তা নিয়ে এখন জোরেশোরে কথাবার্তা চলছে।

এ প্রসঙ্গে প্রগতিবাদীদের বক্তব্য হলো— কোনো সমস্যা নেই, এগিয়ে যাও। আমাদের উচিত একে অনুমোদন দেয়া।

রক্ষণশীলরাও তাদের মাতৃভূমি থেকে শুনে আসা কথাই বলতে থাকে। এর ফলে তারা ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়ে। তাদের বক্তাগণ এ দেশে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হন।

এখন আমার বক্তব্য সতর্কতার সাথে বুঝার চেষ্টা করুন। আমি মনে করি, তাদের আলেমদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয়। আমরা কি সমকামিতা সমর্থন করি? না। কিন্তু তার মানে কি এই দেশের সমকামীদের বিরুদ্ধে নোংরা, ইতরোচিত ও আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলতে হবে? না। এটি তাদের দেশ। তারা সমকামিতা করতে চায়। এই ব্যাপারটি নিয়ে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা অসন্তুষ্ট। কিন্তু রাজনৈতিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাদের ব্যাপার।

বিচ্যুত মুসলমানের সাথে ব্যবহারের আদব

সমকামিতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে— এমন কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হলে অধিকাংশ রক্ষণশীল মুসলমান অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর আচরণ করে। মুখের উপর বলে দেয়— আমাদের মসজিদ থেকে বেরিয়ে যান। আপনাকে আমাদের

কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার কথা হলো, এই ব্যক্তি একজন মুসলিম। তিনি এই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছেন। একজন ভালো মুসলমান হতে চাচ্ছেন। তিনি তো আর প্রগতিবাদীদের মতো নিজেকে সঠিক দাবি করছেন না। তিনি তো বলছেন না যে সমকামিতা হালাল, আপনি কেন একে হারাম বলছেন? আমি সমকামীদের নিয়ে মসজিদে প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করবো।

তিনি যদি এমন কিছু না বলে থাকেন এবং তার কথা যদি হয় এমন— দেখুন, আমি সহজে এটি ছাড়তে পারছি না। তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। অর্থাৎ তিনি যদি ভুল স্বীকার করে বলেন যে আমি জানি এটি একটি সমস্যা। তবে এই অভ্যাস থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছি।

কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদক ছেড়ে দেয়ার চেষ্টারত থাকলে তার সাথে আমরা যেমন সহমর্মিতামূলক আচরণ করি, উপরোল্লিখিত ধরনের সমকামী মুসলমানদের সাথে কেন তা করতে পারি না? আপনি কি মসজিদের মুসল্লীদের জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন— এই যে ভাই, আপনি কি কখনো মদপান করেছেন? আপনি কি কখনো ড্রাগস নিয়েছেন? কিংবা ধরুন, আপনি জানেন এক ব্যক্তি মদপান করে। তাকে পানশালায়ও যেতে দেখেছেন। তারপর সেই লোকটি জুমার নামাজ পড়তে এলো। আপনি কি তখন বলা শুরু করেন— মুসল্লী ভাইয়েরা, এই লোকটি পানশালায় মদপান করে। আপনি কি এভাবে সিন ক্রিয়েট করেন? নিশ্চয় করেন না। বরং আপনার বা আমার বলা উচিত 'আলহামদুলিল্লাহ, লোকটি অবশেষে জুমার নামাজ আদায় করতে এসেছে।' তাই না?

তাহলে কেন আমরা দুজনের সমস্যাকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে পারি না? যে ব্যক্তি সমকামিতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, তার প্রতি কেন সহানুভূতিশীল হতে পারি না?

গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি মানেই কি আপসকামিতা?

আমি কি তাহলে ইসলামী আইন পরিবর্তন করার কথা বলছি? না। আমি মোটেও সমকামিতাকে অনুমোদন করার কথা বলছি না। এমনটা বলছি না যে— চলো, এটিকে বৈধ করে নেই। তারপর ব্যাপারটা উদযাপন করি। গরু-ভেড়া জবাই করে ভোজের আয়োজন করি। এভাবে ভেগান ইস্যুতে ফিরে যাওয়ার কথা বলছি না। তবে আমি বলতে চেয়েছি, এসব লোকদের সাথে আমরা যে ধরনের আচরণ করি, তা পুনর্বিবেচনা করতে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ আমাদেরকে বাধ্য করেছে।

ভালো আচরণ করতে অসুবিধা কী? আমার চেয়ে একটু ভিন্নতর সমস্যায় নিমজ্জিত একজন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আমরা কি একটু সহানুভূতিশীল হতে পারি না? এই সমস্যায় আমি হয়তো নাও পড়তে পারি, তাই বলে এই পথ থেকে তার ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টার প্রতি কি সহানুভূতি প্রকাশ করবো না? তার সাথে কি আমার কদর্য ও সংকীর্ণ আচরণ করতে হবে? তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে? তাকে যাচ্ছেতাই বলতে হবে? কখোনোই না। অন্য আর দশটা গোনাহগার মুসলিমের মতো তাকে আমি বড়জোর বলতে পারি— ভাই, আল্লাহ সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। মসজিদে চলুন। বেশি বেশি কোরআন পাঠ করুন। আপনি যদি এখনো এই অভ্যাস থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে না পারেন, তাহলে তা আমাদেরকে বলার দরকার নেই। এটি আল্লাহ এবং আপনার মধ্যে গোপন রাখুন। কাউকে বলার দরকার নেই। আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করুন এবং একজন ভালো মুসলমান হওয়ার চেষ্টা করুন।

উপরোক্ত পরামর্শগুলোই আমাদের দেয়া উচিত। আমি কী বলতে চাইছি, আপনারা নিশ্চয় তা বুঝতে পারছেন। আমরা ইসলামী আইন পরিবর্তন করার কথা বলছি না। তবে আমরা চাইলে ইসলামী আইনের প্রচলিত ব্যাখ্যার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি।

মুসলমানদের এই পাঁচটি ধারা সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনাগুলো এতক্ষণে বোধহয় আপনাদের সামনে পরিষ্কার করতে পেরেছি।

সংস্কারের দিকনির্দেশনা

বক্তব্য শেষ করার আগে সংস্কারের জন্য কিছু দিকনির্দেশনা তথা ইসলামে সংস্কারের পদ্ধতি, মাত্রা ও পরিধি নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমার মতে, ইসলামী সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় মাথায় রাখা উচিত।

১। খেলা একই, শুধু মাঠ আলাদা

আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই পাঁচটি ধারা সবসময়ই ছিল, এগুলো নতুন কিছু নয়। তবে কোনো কোনো ইস্যু হয়তো নতুন হতে পারে। ভেগানিজম নয়, আমাদের ইস্যু হচ্ছে সমকামিতা, জেন্ডার রোল ইত্যাদি। আজ থেকে হাজার বছর আগে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলির সম্পর্ক। অর্থাৎ, এ প্রসঙ্গে আপনি কি গ্রিকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মানবেন নাকি কোরআন-সুন্নাহর বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করবেন— তা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

কিন্তু এখন আর এই ইস্যুর প্রাসঙ্গিকতা নেই। এখন ইস্যুর পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তনে মানুষ কীভাবে সাড়া দেয়? বাস্তবতা হলো, মানুষের চিন্তাভাবনার পরিসর বেশ সীমিত। ফলে খেলা আগেরটাই আছে, শুধু মাঠের পরিবর্তন হয়েছে। খেলার নিয়মনীতিও আগের মতোই আছে, শুধু স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটেছে।

তাই যে পাঁচটি ধারার কথা বলেছি, এর কোনোটাই নতুন নয়। মহানবীর (সা.) যুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই ধারাগুলো ছিল এবং আছে। তবে এর মানে এই নয় যে পাঁচটি ধারাই সঠিক। বলতে দ্বিধা নেই যে মুরতাদ ও প্রগতিবাদী ধারার প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। প্রগতিবাদীদেরকে আমি হিসেবের মধ্যে ধরি না। তারা যতটা স্মার্ট হিসেবে নিজেদের দেখায়, আসলে ততটা নয়। তারা নিজেদেরকে উঁচুমানের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মনে করে, যদিও তারা তা নয়।

রক্ষণশীলদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। এক দশক আগে আমি নিজেও এই

ধারার সাথে যুক্ত ছিলাম। আমি মনে করি, এটি ইসলামের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ধারা। আমি এখনো মসজিদে তাদের সাথে সময় কাটাই। তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা নিয়েই তাদেরকে বলতে চাই, আপনাদের পালিত ইসলাম আপনাদের উত্তরসূরীদের পক্ষে পালন করা হয়তো সম্ভব হবে না। ডমিন্যান্ট সংস্কৃতির অংশ হলেও গঠনমূলক কোনো উপাদান গ্রহণ করা অন্যায় নয়। এতে বরং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে ইসলাম পালন করা সহজ হবে।

২। আলেমদের দায়িত্ব

প্রতিটি ইস্যুকে কোরআন-হাদীস এবং আধুনিক ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করা আলেমদের দায়িত্ব। এটি সাধারণ মুসলমানদের কাজ নয়। আমি সবসময় বক্তব্যকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তারপরও শ্রদ্ধেয় অনেক আলেম এই বলে সমালোচনা করেন— ইয়াসির! তুমি তো সাধারণ মুসলমানদেরকে মুজতাহিদ হতে বলছো!

এই অভিযোগটি মোটেও সত্য নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে তাদের কাছে জানতে চাই— পোশাক, জন্মদিন, ভোটাধিকার প্রয়োগসহ যে কোনো ইস্যুর পর্যালোচনা করা কার দায়িত্ব? সুন্নাহ নিয়ে যাদের গভীর অধ্যয়ন রয়েছে, তেমন অভিজ্ঞ আলেমদেরই এটি দায়িত্ব।

আমি ঠিক এই কাজটিই করছি। কোনো বিষয়ে বিভিন্ন মাজহাবে যেসব মতামত দেয়া হয়েছে, আমি সেগুলো তুলে ধরি। যেন আপনারা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারেন। পাশাপাশি এটিও যেন বুঝতে পারেন যে মতামতের এতো বৈচিত্র্য (spectrum of opinion) কেন। এই কাজগুলো করা সাধারণ মুসলমানের দায়িত্ব নয়। দুয়েকটা লেকচার প্রোগ্রাম বা কয়েকটি সাপ্তাহিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করলেই তো আর আলেম হওয়া যায় না।

৩। মতামতের বৈচিত্র্য

বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বদা মতপার্থক্য হয়। সবাই মিলে একটি একক মতামত (uniformity of opinion) গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। এর ভালো একটি উদাহরণ হচ্ছে ‘ওমর সিরিজ’। ছয়জন আলেম এই সিরিজ নিয়ে কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং পর্বের শেষে প্রদর্শিত নামের তালিকায় তাঁদের নাম দেয়ার জন্য অনুমোদনও দিয়েছিলেন। তাঁদের ২/৩ জনের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে অন্যান্য আলেমগণ তাদের সমালোচনা করেছেন— আপনাদের সাহস তো কম নয়! সমালোচনার প্রবল চাপে তাঁদের কেউ কেউ 'ভুল' স্বীকার করেন এবং 'আমরা আসলে বুঝতে পারিনি' জাতীয় বিবৃতি দিয়ে নিজেদেরকে বিতর্ক থেকে সরিয়ে নেন।

অতএব, আলেমদের মাঝে, বিশেষত রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী আলেমদের মাঝে মতানৈক্য হতেই পারে। প্রতিটি অগ্রগামী চিন্তা বা উদার মতামত মাত্রই যেমন সঠিক নয়, তেমনই প্রতিটি রক্ষণশীল মতামত মাত্রই পশ্চাৎপদ নয়। মাঝেমধ্যে ব্যতিক্রমও হতে পারে। কখনো কখনো রক্ষণশীল মতামত তুলনামূলকভাবে ভালো হয়। এমনকি সংস্কারপন্থীদের জন্যও তা ভালো। আবার কখনো কখনো অগ্রগামী চিন্তাই তুলনামূলকভাবে ভালো হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

তাই পরিবর্তন মাত্রই ইতিবাচক নয়। সংস্কারপন্থীরাও তেমনটা দাবি করছেন না। আমিও তা বলছি না। প্রতিটি বিষয়েই আলেমগণ বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটি করতে গিয়ে তাদের মাঝে কিছু বিষয়ে মতের ভিন্নতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, আলেমরা কখনোই ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না।

আরেকটি বিষয়ে বলা দরকার। আলেমগণ যেসব বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছেন, সেসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনকে টিকিয়ে রেখেছেন। কোনো বিষয়ে যদি আলেমদের সর্বসম্মত মতামত থাকে, তাহলে তার উপর আপনার আস্থা রাখা উচিত। আর যদি মতামতের ভিন্নতা থাকে, ভিন্নমত পোষণকারী আলেমগণ সংখ্যায় কম হলেও আপনি যে কোনো একটি মতামত বেছে নিতে পারেন। ওমর সিরিজের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। ছয়জন আলেম একে অনুমোদন দিয়েছেন। আর মূলধারার সুন্নী ফতোয়া কমিটিগুলো এর বিপরীত মতামত দিয়েছেন। তারপরেও এ সম্পর্কিত ইখতিলাফ তথা মতানৈক্যের বৈধতা রয়ে গিয়েছে। এর ফলেই চতুর্থ আরেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে প্রসঙ্গে এখন বলবো।

৪। প্রকৃত আলেমের অনুসরণ করা

অন্তত টানা ১৫-২০ বছর অধ্যয়ন করতে না চাইলে আলেম হওয়া আপনার কাজ নয়। তাহলে আপনার কাজ কী? আপনার কাজ হবে এমন একজন আলেমকে বেছে নেয়া, যার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ দুটি আছে:

ক) তিনি হবেন পূর্ণ ঐকান্তিক ও তাকওয়াসম্পন্ন। কে এ ধরনের ব্যক্তি, তা হয়তো আপনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন না, তবে উপলব্ধি করতে পারবেন। এ

ধরনের ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলেন, টাকার বিনিময়ে ফতোয়া দেন না এবং যথেষ্ট বিবেকবান হয়ে থাকেন।

খ) এ ধরনের ব্যক্তি ইসলামী বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি আলেমদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ইসলামের পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন।

যোগ্য আলেম চেনার উপায়: চিকিৎসার জন্য আপনি কীভাবে ডাক্তার ঠিক করেন? শুধু যোগ্যতা থাকলেই কি তার কাছে আপনি চিকিৎসা নিতে যান? নাকি যে ডাক্তার আপনার কথা আগ্রহ নিয়ে শোনে, তার কাছেই যান? শরীয়তের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি প্রযোজ্য। নিজে ডাক্তার না হয়েও আমরা কীভাবে ডাক্তার নির্বাচন করি? খরচ বাঁচানোর চিন্তা করি নাকি ভালো সার্ভিস পাওয়ার চিন্তা করি? কোন ডাক্তার কার চেয়ে বেশি টাকা নিচ্ছে, তা কি বিবেচনা করি? অবশ্যই না। কারণ, এটি জীবন-মরণের প্রশ্ন।

‘শায়খ গুগল’ থেকে ডাক্তারি শেখা কোনো ডাক্তার ফি কম নিলেও যেমন তার কাছে যান না, তেমনিভাবে শুধু নিজের সুবিধাজনক ফতোয়ার জন্য আপনি কোনো আলেমের কাছে যেতে পারেন না। যিনি যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আপনার সমস্যার ব্যাপারে আন্তরিক বলে মনে করেন, তেমন ডাক্তারের কাছেই তো আপনি যান। তাহলে শরীয়তের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার মানতে পারবেন না কেন? এ ক্ষেত্রে তো বরং এই নীতি আরো বেশি করে মানা উচিত। তাই এমন আলেমের কাছে যাওয়া উচিত, যিনি যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং খোদাভীরু বলে আপনি মনে করেন।

সাধারণ মুসলমানদের অযুহাত: আপনার এবং আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞানী একজন মুজতাহিদ আলেম খুঁজে বের করা। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটিই চূড়ান্ত ইজতিহাদ। এর ফলে কেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহর কাছে এই বলে কৈফিয়ত দিতে পারবো— হে আল্লাহ! আমি কোনো ফিকাহবিদ নই। তবে অমুক আলেমকে অনুসরণ করেছিলাম, যিনি একে হালাল বলেছিলেন।

আপনি যদি আন্তরিক হন এবং এমন একজন আলেমকে অনুসরণ করেন যাকে সত্যিকার অর্থেই আলেম বলে মনে হয়, তাহলে নিশ্চয় নাজাত লাভ করবেন। কারণ, তখন বলতে পারবেন— হে আল্লাহ! আমি কোনো আলেম নই। আমি অমুক আলেমকে বিশ্বাস করেছিলাম, যিনি বলেছিলেন— এইগুলো হালাল, আর ওইগুলো হারাম। আমি তার কথা অনুযায়ী আমল করেছিলাম।

তাহলে আপনার দায়িত্ব কী? আপনার কাজ হচ্ছে দ্বীনি বিষয়ে এমন কাউকে অনুসরণ

করা, যাকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে মনে করেন। আর যদি রক্ষণশীল কিংবা সংস্কারপন্থী ধারার সাথে থাকেন, তাহলেও সমস্যা নেই।

প্রখ্যাত আলেমদের অবস্থান: এটি নিশ্চিত যে মুরতাদদের মধ্যে কোনো আলেম নেই। প্রগতিবাদীদের মাঝেও কোনো আলেম নেই। উগ্রপন্থী বা জিহাদী দল হিসেবে পরিচিত গ্রুপগুলোর মাঝে অল্প কয়েকজন আলেম থাকলেও তারা এসব ক্যাম্পে যোগ দেয়ার পরেই আলেম হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন। সেখানে এমন একজন আলেমও নেই, যিনি এসব গ্রুপে যোগ দেয়ার আগে থেকেই বিখ্যাত ছিলেন। তারা কেউই প্রকৃত ও স্বীকৃত আলেম নন। রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী ধারার মধ্যেই কেবল প্রকৃত আলেমদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

৫। যথাসম্ভব কম সমালোচনা করা

আমার শেষ পরামর্শ হলো— অন্যদের যুক্তিখণ্ডন ও সমালোচনা যথাসম্ভব সর্বনিম্ন মাত্রায় রাখার চেষ্টা করবেন। এই অভ্যাস পুরোপুরি দূর করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। অন্য মুসলমানরা যদি এমন কিছু করে, যার বৈধতা তাদের আলেমগণ দিয়েছেন; তাহলে তা আল্লাহ তায়ালা ও তাদের মধ্যকার ব্যাপার। আপনি বড়জোর নতুন ধারার চিন্তাভাবনা কিংবা অন্য কোনো আলেমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ ব্যাপারে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে পারেন। ব্যস, এটুকুই আপনার দায়িত্ব। সাধারণ মুসলমান হিসেবে কারো সাথে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়া আপনার উচিত হবে না। যে কোনো বিষয়েই মতামতের বৈচিত্র্য থাকতে পারে।

ফেরকার চেয়ে নিয়তই বেশি গুরুত্বপূর্ণ: কেউ ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট একটি ধারা অনুসরণ করতে চাইলে তা খারাপ কিছু নয়। একান্ত আন্তরিক নিয়তে কেউ কিছুটা রক্ষণশীল কিংবা কিছুটা উদার ধারা অনুসরণ করলে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাকে এর জন্য শাস্তি দেবেন না।

সৎ নিয়তে কেউ কোনো কিছুকে হালাল মনে করলে তা নিয়ে শংকার কিছু নেই। যে কোনো ফেরকা, দল বা জামায়াতের চেয়ে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমাশীলতার পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও রাসূলের (সা.) অনুসরণ করাই যদি আপনার নিয়ত হয়ে থাকে, তাহলে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে গেলেও দুনিয়া উল্টে যাবে না।

প্রকৃত ধার্মিকতা: আপনার ইবাদত, নামাজ, যাকাত ইত্যাদির বিনিময়ে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। আশাবাদী মনোভাব থাকতে হবে। ছোটখাটো

কোনো বিষয়ে আপনার সাথে কারো মতপার্থক্য হলেই সে জাহান্নামী হয়ে যাবে, ব্যাপারটা তা নয়। এটি বিরিয়ানীর পরিবর্তে শর্মা খাওয়ার মতোই নগণ্য ব্যাপার। সত্যিকারের তাকওয়ার সাথে আল্লাহর ইবাদত করা এবং রাসূলকে (সা.) সম্মান করাই হলো প্রকৃত ধার্মিকতা।

তারমানে সবাই সঠিক, তা নয়। এর প্রকৃত মানে হচ্ছে, কারো সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়া আপনার কাজ নয়। কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। তখন তারা নিজেদের মাঝে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবেন।

উপসংহার

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সর্বশেষ কিছু কথা বলতে চাই। নিরামিষ ভোজন তথা ভেগানিজম কিংবা মাংস খাওয়া আমাদের ইস্যু নয়। এই দেশে আপনার প্রাসঙ্গিক ইস্যু হচ্ছে কীভাবে একজন বৃটিশ মুসলিম হওয়া যায়। অন্যদিকে, কীভাবে একজন আমেরিকান মুসলিম হওয়া যায়, তা আমার জন্য প্রাসঙ্গিক। যদিও বাস্তবে এটি বেশ কঠিন ব্যাপার।

কচ্ছপের মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখা

কচ্ছপ ভয় পেলে কী করে? খোলসের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নেয়। আমাদের ধারণা, এটি বুঝি ভালো ও দরকারী। আমার বিনীত মতামত হলো, বেশিরভাগ রক্ষণশীল আন্দোলনই এ রকম।

আপনি জানেন, আপনার সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আপনার ভাষা হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমরা কয়জনইবা আমাদের পূর্বপুরুষের ভাষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারি?

ফলে আমি বুঝি, বাস্তবতা থেকে গুটিয়ে নেয়ার প্রবণতা এক ধরনের ভীতি থেকেই সৃষ্ট। কিন্তু এই প্রচেষ্টা নিছক কোনো রকমে টিকে থাকার নামান্তর মাত্র। এর ফলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধই হয় শুধু। এই কৌশল আমাদেরকে বা পরবর্তী প্রজন্মকে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দিতে পারবে না।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

তাই বাস্তবতাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখতে কোনো সমস্যা নেই। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ থেকে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করাও দোষের হবে না। যেমন: আমরা তাদের ভাষা নিয়েছি। আমি উর্দু বা আরবীর চেয়ে ইংরেজিতে বেশি স্বতঃস্ফূর্ত।

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমঝোতা

তাই যেসব ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্টভাবে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলা নেই, সেসব ব্যাপারে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভের উপাদান গ্রহণ করতে সমস্যা কোথায়? এসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছুটা সাহসী হতে হবে।

আগেও বলেছি, রক্ষণশীলদের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় তাদের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছি। কিন্তু তরুণদের সাথে মেলামেশার ফলে এবং ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রচার ও শিক্ষকতার সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে খোলস থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতে পারছি।

খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসুন

পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থেই আমাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচিত। এখনই এর উপযুক্ত সময়। আমরা হয়তো মাঝপথে হারিয়েও যেতে পারি। কারণ, আমাদের কাছে কোনো প্রতিষ্ঠিত প্যারাডাইম নেই। যখন ডানে মোড় নেয়া উচিত, তখন হয়তো বামে মোড় নিয়ে ফেলবো। লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল করেও ফেলি, তাহলে পেছনের লোকেরা নিশ্চয় তা দেখবে। ফলে তারা এই বিপদ এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে।

ব্রিটিশ ইসলাম

অনেকের বক্তব্য হলো— তোমরা ভুল পথে যাচ্ছো। রক্ষণশীল ধারাই সঠিক। তোমরা জানো না যে তোমরা কোন পথে যাচ্ছো।

আমরা যেহেতু এখনো চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে পারিনি, সেহেতু তাদের কথার যৌক্তিকতা আছে বটে। কিন্তু তারমানে 'ব্রিটিশ ইসলাম' পরিভাষাটি কোনোভাবেই ভুল নয়। আপনারা সবাই ব্রিটিশ এবং একইসাথে মুসলমান। একইসাথে ব্রিটিশ ও মুসলিম পরিচয় ধারণ করার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। এতদুভয়ের মধ্যে সুসমন্বয় সম্ভব। তবে এটি কীভাবে এবং কতটুকু মাত্রায় সম্পন্ন হবে, সেটি নির্ধারণ করার জন্য আমরা আলাপ-আলোচনা করছি। এই সংলাপ অর্থবহ করার জন্য আমরা যথেষ্ট আন্তরিক।

উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যই শেষ কথা নয়

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দিনশেষে আমরা পূর্বপুরুষদের চেয়ে ভিন্ন যুগ ও অঞ্চলে বাস করছি। এই কারণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাস্তবতা বিচেনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য

যে সমৃদ্ধ ও চমৎকার ছিলো, তাও আমরা বুঝি। কিন্তু তারমানে এই নয়, সেই উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে।

যা কিছু প্রয়োজনীয়, আমরা তা গ্রহণ করবো। যেগুলো পরিবর্তন করার অনুমোদন রয়েছে, প্রয়োজনে সেগুলোর পরিবর্তন করবো। আর যা কিছু পরিত্যাজ্য, তা পরিত্যাগ করবো। এগুলো আসলে প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপার এবং এ ধরনের আলোচনা কখনোই পুরোপুরি শেষ হয় না। আলেমগণ সদা সর্বদা এসব বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে আপনারা ইউটিউবে প্রচুর কথাবার্তা ও ভিডিও পাবেন। এসব ক্ষেত্রে আপনার কাজ হচ্ছে, যে আলেমের উপর আপনার আস্থা রয়েছে, তার কথায় অটল থাকবেন। আপনি যদি আন্তরিক হয়ে থাকেন, কেবল আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করতে চান এবং এর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান; তাহলে জেনে রাখুন, মহান আল্লাহর দয়া আমাদের সবাইকে ঘিরে রয়েছে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথের রোল মডেল হিসেবে গড়ে ওঠার তওফিক দান করুন। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দিন। তিনি আমাদেরকে জান্নাতিদের পথে চলার তওফিক দিন। আমরা যেন মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন ও মুমিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারি এবং মহানবী (সা.) ও শহীদদের সাথে কেয়ামতের ময়দানে হাজির হতে পারি, সে তওফিক আমাদেরকে তিনি দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রশ্নোত্তর

[বক্তৃতা শেষে শায়খ ইয়াসির ক্বাদী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুষদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন। সেগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।]

প্রশ্ন—১
প্রগতিবাদীদের সাথে আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

আপনি পাঁচটি ধারার কথা বলেছেন। এর মধ্যে প্রগতিবাদীরা একটি ধারা। আমার জানার বিষয় হচ্ছে, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা এই ধারায় আছে, তাদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রগতিবাদীরা কখনোই বেশি এগুতে পারবে না। তারা সবসময়ই একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসেবেই থাকবে। কারণ, আল্লাহ এই দ্বীনকে রক্ষার ওয়াদা করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের ব্যাপারে বলে গেছেন,

إن أمتي أمة مرحومة

"আমার উম্মতের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে।"

যে কোনো প্রগতিবাদী ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন, তাদের অবস্থা 'খালি কলস বাজে বেশি' প্রবাদের মতো। অর্থাৎ তাদেরকে সংখ্যায় অনেক মনে হলেও আসলে তা নয়।

পাশ্চাত্যের কয়টি মসজিদ সমকামী বিয়ের অনুমোদন দিচ্ছে বা এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে? হাতেগোনা দুয়েকটা বাদে এরকম মসজিদ নেই বললেই চলে। তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো কোনো আইন এখানে নেই। তাদের জীবনের উপর কোনো ধরনের

হুমকিও বাস্তবে নেই। আজকে তারা রাস্তার পাশে একটি মসজিদ খুলে বসলে, তা একান্তই তাদের ব্যাপার। আমি মনে করি, তাদের উপর শারীরিক আক্রমণ চালানো আমাদের জন্য হারাম। এই দেশে তারা কী করবে সেটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এত কিছুর পরেও তাদের অবস্থান কোথায়? আপনি তাদেরকে তেমন একটি খুঁজে পাবেন না। তাই আমি মনে করি, প্রগতিবাদীরা সবসময় একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসেবেই থাকবে।

সাধারণ মুসলমানরা জানে যে মুসলমান থাকতে চাইলে মদ খাওয়া যাবে না। আর খেলেও নিজেকে ভালো মুসলমান দাবি করা যাবে না। কিন্তু আপনি মাদকও গ্রহণ করবেন, আবার বলবেন যে ইসলামই আমাকে এটি করতে বলেছে, তা হতে পারে না। মাদক গ্রহণ করার পর যদি স্বীকার করেন যে হ্যাঁ, আমি খারাপ মুসলমান, তাহলে আপনি কিছুটা হলেও ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকেন। দুনিয়াতে কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু আপনি কোনোক্রমেই অকাট্য হারাম বিষয়কে হালাল দাবি করতে পারেন না। প্রগতিবাদীরা ঠিক এই কাজটিই করে যাচ্ছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

এখন প্রশ্ন হলো তাদের সাথে আপনি কেমন আচরণ করবেন? আমি সত্যি মনে করি, তাদের মানসিক সমস্যা রয়েছে। তারা হীনমন্যতায় ভোগে। ফলে তারা নির্দ্বিধায় ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভের উপর আস্থা রাখে। এ ব্যাপারে আমার মতামত (এটি ভুলও হতে পারে। তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করার চেয়ে ডমিন্যান্ট প্যারাডাইমের বিচার-বিশ্লেষণ করাই আমার মূল উদ্দেশ্য) হলো— মানবতাবাদ নিয়ে পড়তে গেলে দেখবেন এনলাইটেনমেন্ট, পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট, আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা নিয়ে সেখানে কথাবার্তা রয়েছে। উত্তরাধুনিকতার মূল কথা হচ্ছে, মানুষের বিবেচনাবোধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো নৈতিক মানদণ্ড নেই। অথচ আমাদের কাছে নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে কোরআন ও হাদীস রয়েছে। আমরা যদি এগুলো অনুসরণ না করি, তাহলে সত্যিকার অর্থে আর কোনো নৈতিক মানদণ্ড অবশিষ্ট থাকে না।

তাই আমরা দেখি, পঞ্চাশ বছর আগে যে বিষয়গুলোকে মন্দ বলে বিবেচনা করা হতো, এখন সেগুলোর বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা এসব দেখছি। অথচ আশির দশকেও এ ধরনের কিছু কিছু বিষয়কে নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর এখন এই বিষয়গুলোর বিন্দুমাত্র সমালোচনা করলেও আপনাকে পশ্চাৎপদ মনে করা হবে।

পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই যে কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আমরা যদি সাহসিকতার সাথে ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিষয় তথা আল্লাহর বাণীর উপর অটল থাকি, তাহলে আর কোনো বাধা থাকবে না। আমাদের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

আমি মনে করি, ওইসব ভাই ও বোনদের যুক্তিখণ্ডন করা কিংবা 'এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন' জাতীয় রেফারেন্স দিয়ে খুব একটা লাভ নেই। কারণ, তাদের অন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ঈমান নেই।

তবে তাদেরকে দুইভাবে মোকাবেলা করা যায়। প্রথম উপায়টি হলো আধুনিক চিন্তা এবং দর্শনের বিশ্লেষণ করা। অবশ্য এই কাজটা ইতোমধ্যেই এক প্রকার সম্পন্ন হয়ে গেছে। আধুনিক জ্ঞানজগতের অসংখ্য চিন্তাবিদ উত্তরাধুনিকতাবাদ কিংবা উত্তর-কাঠামোবাদ নিয়ে কাজ করেছেন। উত্তরাধুনিকতাবাদ নিয়ে জানতে গুগল সার্চ করতে পারেন। অন্তত এ সংক্রান্ত উইকিপিডিয়ার পাতাটি পড়ুন। এভাবে কিছুটা ঘাঁটাঘাঁটি করলে এ ব্যাপারে খানিকটা ধারণা পাবেন। এই ধারণাগুলো বুঝতে পারলে তাদেরকে মোকাবেলা করার একটি পথ আপনি পেয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় উপায়টি হলো কোরআনের বাণী, আধ্যাত্মিকতা ও দরদপূর্ণ নানা উপায়ে তাদের অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলনে সহায়তা করা।

মোটকথা হলো, এটি এক ধরনের দ্বৈত প্রক্রিয়া। একদিকে ডমিন্যান্ট ন্যারাটিভগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্যদিকে, তারা যেন সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতি অনুগত হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে, সে ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে।

ইসলাম হচ্ছে একটি সামগ্রিক ব্যাপার। আপনি যদি আল্লাহ ও কোরআনের উপর বিশ্বাস রাখেন, তাহলে আল্লাহর নাজিলকৃত গ্রন্থের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করাটাই হবে আপনার জন্য সবচেয়ে যৌক্তিক কাজ। এমনকি প্রতিটি বিধান যদি নাও বুঝে থাকেন। যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন যে এগুলো আল্লাহরই বিধান, তাই এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

এ বিষয়ে আগেও কথা বলেছি। আপনারা চাইলে কয়েক বছর আগে অনুষ্ঠিত আমার 'দোহা ডিবেট' দেখতে পারেন। সেখানে একজন নারী প্রশ্ন করেছিলেন— দুইজন নারীর পরস্পরকে বিয়ে করার বিধান ইসলামে থাকা উচিত। এতে সমস্যা কোথায়? এটিকে অন্যায় বলার আপনি কে?

তখন আমরা সেই ইস্যুটি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখান থেকে আপনারা এখনকার প্রগতিবাদী মুসলমানদের সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন। যাইহোক, এ বিষয়ে আমার বেশ কিছু আলোচনা এবং আর্টিকেল রয়েছে।

শেষ কথা হলো, প্রগতিবাদীদেরকে আমি বড় কোনো হুমকি মনে করি না। আমি সবসময় বলার চেষ্টা করেছি, এদের দলে হাজার হাজার মুসলিম তরুণ কখনোই যোগ দেবে না। দিলেও বড়জোর এক শতাংশ। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন—২
সমকামীদের সাথে আচরণ

আমাদের কমিউনিটির রাজনৈতিক ও আইনী স্বার্থ রক্ষার জন্য রক্ষণশীল আলেমদের যুক্তিসম্মত মতামতগুলোকে আমরা যেভাবে সেল্ফ-সেন্সরশিপ করছি, এর মাধ্যমে আমরা কি নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি?

উত্তর

আমরা সেল্ফ-সেন্সরশিপ করছি বলে আমি মনে করি না। বাস্তবে বরং উল্টোটাই হচ্ছে। আমি মনে করি, অধিকাংশ মানুষই অনর্থক কথাবার্তা বলে থাকে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমরা কোনো ন্যারাটিভের মূল কথাটি ধরতে পারি না। আমরা কোনো সমস্যার গভীরে না গিয়েই তা থেকে উত্তরণ পেতে চাই।

এই মুহূর্তে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে সমকামী সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের মনোভাব। আমার বিনীত অভিমত হলো, এ ব্যাপারে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। আমার এ কথা থেকে আবার আমাকে সমকামীদের পক্ষের লোক মনে করবেন না যেন। আমি মনে করি, আমাদের মতামত ভদ্রোচিত ভাষায় ব্যক্ত উচিত। অগ্রহণযোগ্য ভাষা ব্যবহার করা মোটেও উচিত নয়। কোনটি নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক, অর্থাৎ নৈতিকতার ব্যাপারে আমাদের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমাদের মসজিদে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যত্যয় ঘটাবো না। আমাদের বিয়েতেও সমকামিতাকে অনুমোদন করবো না। কিন্তু একইসাথে মসজিদের বাইরে এসব ইস্যুতে আমরা জড়াবো না।

দুজন লোক পানশালায় গেলে আমরা কিন্তু পানশালায় যাওয়ার বিরুদ্ধে আইন করার দাবি তুলি না। একইভাবে তারা যদি আমাদের দৃষ্টিতে অনৈতিক কোনো কাজ করে, তাহলে তাদের ক্ষতি করা বা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব নয়। তারা যা করছে, তা তাদের ব্যাপার।

আমি একে সেল্ফ-সেন্সরশিপ নয়, বিচক্ষণতা হিসেবে বিবেচনা করি। আপনার বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই শালীনভাবে উপস্থাপন করা উচিত? এতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন: মূর্তিপূজা নিয়ে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, তারা যে মূর্তির পূজা করে, সেগুলোকে গালমন্দ করো না। তারমানে কি আমরা সেগুলোকে সম্মান করি? আমরা সেগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখি? না। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

“তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে।” (সূরা আনআম: ১০৮)

কেন? আপনি তাদের কাছ থেকে কী অর্জন করতে চাচ্ছেন? আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন আপনার কথাগুলো বিবেচনা করে এবং তাদের কাজকর্মে এর প্রতিফলন

ঘটায়। দেখুন, মুসাকে (আ.) আল্লাহ তায়ালা উপদেশ দিয়েছিলেন এভাবে,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ

"অতঃপর, তোমরা দুজনে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা ত্বহা: ৪৪)

অর্থাৎ, এই বিনম্র কথাগুলো হয়তো তাকে নাড়া দিয়ে যাবে, যা তাকে ভালো চিন্তা করতে সহায়তা করবে।

যাইহোক, বর্তমানে মূর্তিপূজা কোনো ইস্যু নয়। আমি মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বললেও আপনাদের বৃটিশ সরকার এতে গা করবে না। কিন্তু আমি যদি সমকামিতার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় কিছু বলি, তাহলে এই দেশে এটিই আমার শেষ সফর হতে পারে। কারণ, এটি একদম ভিন্ন একটি ব্যাপার। তাই আমি যদি এ বিষয়টা একটু ভিন্নভাবে বলি, তাহলে তারা আশ্বস্ত থাকে। তাই না?

গার্ডিয়ান পত্রিকাসহ অনেকেই আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তারা আমার কাছে জানতে চায়— অমুক ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আমি বলেছি—ইসলামে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক অনুমোদিত নয়। এ কথার সাথে তারাও একমত।

যেহেতু বিবাহ-বহির্ভূত যে কোনো সম্পর্ক অনৈতিক, তাই বিবাহ-পূর্ব সম্পর্ক বা সমকামী সম্পর্কও আমাদের দৃষ্টিতে অনৈতিক। কিন্তু কেউ যদি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমরা তার ক্ষতি করি না। আমরা কোনো কিছু চাপিয়ে দেই না। কোনো সমকামী মুসলমান আমাদের কমিউনিটিতে এলে আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আমরা তার ওপর হামলা করি না। মূলধারার অনেক খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের অবস্থানও এ রকম। তাদের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?

আমি সাক্ষাৎকারে বলেছি, মুসলমানরা তাদের ব্যাপারে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করে না। মুসলমানদের সরল বক্তব্য হচ্ছে— মদ্যপানকে আমরা যে কারণে সমর্থন করি না, একই কারণে সমকামিতাকেও সমর্থন করি না।

আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, আইনগত ও জ্ঞানগত দিক থেকে আমাদেরকে আরো বেশি প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছেন, এর দাবি হচ্ছে সুন্দর ভাষায় কথা বলা। মহানবীর (সা.) সীরাত অধ্যয়ন করে দেখেছি, এটিই ছিল তাঁর সুন্নত। তিনি স্বীয় বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং এ ব্যাপারে আপস করেননি। কিন্তু এসব ব্যাপারে তিনি সুন্দর ভাষা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে অপমান বা হেয় করা উচিত নয়।

তাই সেল্ফ-সেন্সরশিপ নয়, বরং উল্টোটাই সত্য বলে আমার ধারণা। এ ধরনের বিষয়ে এখনই আমাদের খোলামেলা আলাপ-আলোচনা শুরু করা উচিত। যাতে করে আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সুন্নতের ভাষায় কথা বলার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন—৩
কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক

প্রশ্নটা নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। এ ব্যাপারে রক্ষণশীলদের পরামর্শ যথেষ্ট সতর্কতামূলক। এতে শরীয়তের সীমা সংকুচিত হয়ে পড়ার আশংকাও থাকে। যেন আমাদের পক্ষে দৃঢ় নৈতিকতাসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এক দৃষ্টিতে তা অবাস্তবও বটে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক কীভাবে বজায় রাখা যায়? যেমন: নারীদের সাথে হ্যান্ডশেক করা ও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা একটি পেশাগত সৌজন্যতা। কিন্তু শরীয়তের দিক থেকে এর বিপরীত ধারণাই আমরা পাই। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে আপনি কীভাবে সমন্বয় করবেন?

উত্তর

এটি নিঃসন্দেহে এখন কর্মক্ষেত্রের অন্যতম একটি সমস্যা। কর্মজগতে গিয়ে ঠিক কী ধরনের আচরণ করতে হবে— আমরা যারা এখনো কর্মক্ষেত্রে পা ফেলিনি তারা তা ভাবতেও পারি না। কোনো বিষয়ে কট্টরতা দেখানো খুব সহজ। কিন্তু আপনি যখন কর্পোরেট জগতে পা ফেলবেন, পেশাগত নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, এর ডাইনামিকস বুঝবেন; তখন কিছুটা হলেও আপনার মনোভাব পরিবর্তিত হবে।

বাস্তবতা হলো, এই সমস্যাটির মতো আরো জটিল বিষয়গুলো আমাদের সামনে রয়েছে। এসব সমস্যার ফলে ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে আমাদের অনেকে ইসলামকে এমন কঠোর বানিয়ে ফেলে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) করেননি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে যে কোনো ধরনের যোগাযোগ মাত্রই যেন নৈতিক অধঃপতন তথা পুরোপুরি হারাম!

অথচ আমাদের ক্লাসরুম বা আলোচনা সভাগুলোতে বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে কোনো সমস্যা হয় না। আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানের কথাই ধরুন। আপনারা প্রত্যেকে বিপরীত লিঙ্গের কত কাছাকাছি বসে আছেন! আস্তাগফিরুল্লাহ! আপনারা এখানে সার্ডিন মাছের মতো জটলা বেঁধে থাকলেও পাশের সিটে কে বসবে, তা আপনি ঠিক করেননি। তাই না? কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকলে এখানে আপনারা পাশাপাশি বসতে পারেন বটে। কিন্তু ওই রকম কোনো সম্পর্ক থাকলে, সেটি একটি সমস্যা। তবে আমি বলছি না যে এভাবে বসা হালাল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কীভাবে সন্তোষজনক একটি সমাধানে পৌঁছতে পারি? বাস্তবতা হলো, এটি চলমান একটি বিতর্ক, যার সমাধান আমার কাছে নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে

দুটি প্রান্তিক অবস্থান তৈরি হয়েছে। একদিকে, আমাদের অনেক ইসলামিক সেন্টার এবং মসজিদ নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের ব্যাপারে এতটাই কঠোর, যা সাহাবী ও প্রথম যুগের মুসলমানরা কল্পনাও করতে পারতেন না। এই কঠোরতা স্বয়ং মহানবী (সা.) ও সাহাবীদের চেয়েও বেশি। দেখলে অবাক লাগে। ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার তৈরিসহ সম্ভাব্য সকল উপায়ে এই কঠোরতা আরোপ করা হয়। আমি এ ধরনের কঠোরতার বিরোধী। এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। এগুলো শুধু ইসলামী শিক্ষা সমাবেশেই বজায় থাকে। এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া মাত্রই এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। তাহলে এই কৃত্রিম বুদ্বুদ তৈরি করার মানে কী?

আমি আবারো পরিষ্কারভাবে কিছু কথা বলতে চাই। নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে কথা বলাই এখন বড় একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, পাপাচারের আশংকায় আমরা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামী সার্কেলের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। ফলে আমরা বিপরীত লিঙ্গের কোনো মুসলিমের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ও সম্মানের সাথে কথা বলতে শিখি না। অথচ বিপরীত লিঙ্গের অমুসলিমদের সাথে কীভাবে চলতে হয়, তা ঠিকই জানি। বিপরীত লিঙ্গের অমুসলিম কেউ এসে যখন বলে, ‘হ্যালো, গুড আফটারনুন। দিনকাল কেমন যাচ্ছে?’ তখন কী বলা উচিত তা আপনি ঠিকই জানেন। কোনো ধরনের চটুলতা ছাড়াই ভদ্রোচিত ও সম্মানজনকভাবে জবাবও দেন। অথচ কোনো ইসলামী সম্মেলন বা অন্য কোথাও একজন হিজাবী বোন কোনো দাড়িওয়ালা মুসলিম ভাইকে সালাম দিলেও তিনি সাথে সাথে ভাবতে শুরু করেন— সে কি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে? সে কি বিবাহিত? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটি অবশ্যই একটি সমস্যা। যৌনতার চিন্তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে আপনি অন্যদের সাথে উঠাবসা করতে পারছেন না। কেন পারছেন না? কারণ, আমরা নিজেরাই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছি। পুরুষ ও মহিলা সাহাবীগণ কি এ রকম ছিলেন বলে আপনার মনে হয়? তাঁদের জীবনী পড়লে ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁরা সম্মানের সাথে একে অপরকে সালাম দিতেন। তারা তাদের সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অথচ আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আমরা এগুলো শেখাই না। আমার মতে, যুগ যুগ ধরে ইসলামের অতি রক্ষণশীল চর্চা এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। শরীয়ত যতটুকু চায়, আমরা তারচেয়েও বেশি কঠোর। এর ফলাফল স্বভাবতই নেতিবাচক হয়েছে।

আমাদের ভাইয়েরা জানে না, বোনদের সাথে কীভাবে সম্মান বজায় রেখে আচরণ করতে হয়। অথচ এটি তাদের প্রাপ্য। রাস্তায় ঘটনাক্রমে পাশাপাশি হাঁটতে থাকলেও তারা বোনদেরকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে চলে, যেন তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। অমুসলিম সহকর্মী বা শিক্ষিকাকে যদি আপনি ‘গুড মর্নিং’, ‘গুড আফটারনুন’ বলে সম্ভাষণ জানাতে পারেন; শপের ক্যাশিয়ার বা বাস ড্রাইভারকে যদি ‘হ্যালো’ বলতে পারেন; তাহলে আপনার পরিচিত মুসলিম বোন কি এরচেয়েও বেশি সম্মানের

উপযুক্ত নন? আপনি কি কোনো প্রকার কুচিন্তা ছাড়া তাকে সালামও দিতে পারেন না? কোনো প্রয়োজন বা বিপদে কিংবা অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে পড়ে তিনি আপনাকে দেখে সাহায্যও তো চাইতে পারেন। কিন্তু না! তাকে এমনভাবে উপেক্ষা করতে শেখানো হয়েছে, যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই! নারী-পুরুষ উভয় তরফ থেকেই এটি ঘটছে। এটি একটি বাস্তব সমস্যা।

আমরা যেভাবে নারী-পুরুষকে সম্পূর্ণ দুই জগতের বাসিন্দা বানিয়ে রেখেছি, সীরাত অধ্যয়ন করলে এ ধরনের গোঁড়ামির কোনো অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। আমি মাদানী যুগের কথাই বলছি। এবার ইংল্যান্ডের কথা চিন্তা করুন, যে সমাজে নারী-পুরুষের কোনো বিভাজন নেই। সেখানে আমরা যদি কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করি, তাহলে এর পরিণতি কী হবে?

আমার এ কথা থেকে কেউ আবার এমনটা মনে করবেন না যে আমি বুঝি বলতে চাচ্ছি— মাশাআল্লাহ, তাবারাকাল্লাহ, চলুন নারী-পুরুষের সম্মিলিত একটি পার্টি হয়ে যাক! আমি মোটেও তেমন কিছু বুঝাচ্ছি না। আমার মতো কেউ যখন এ ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করে, তখন রক্ষণশীলরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা বলে ফেলে— এসব কথা বলে আপনি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?

এটি হলো আরেকটা সমস্যা। আমি তাদের এই ভীতির কারণটা বুঝি। যুক্তিবিদ্যার ভাষায় একে 'ফ্লাডগেট আর্গুমেন্ট' বলা হয়। আমি যদি দরজাটা এক ইঞ্চি পরিমাণও খুলি, তাহলে ধরে নেয়া হয় অবশেষে দরজাটা পুরোপুরিই খুলে দিতে যাচ্ছি— এটিই হলো 'ফ্লাডগেট আর্গুমেন্ট'। কারো বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য এটি অত্যন্ত হালকা ও স্থূল একটি পদ্ধতি।

আমি সীমাতিক্রম করতে বলছি না। তাহলে সীমারেখাটা কী? স্পষ্টতই চটুলতা ও হারাম সম্পর্ক হচ্ছে সেই সীমা। কিন্তু নারী-পুরুষ সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ওঠে কীভাবে একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে হয়, তা যদি উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে না শেখাই; তাহলে আমরা কীভাবে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবো?

আমাদেরকে একে অপরের নাম পর্যন্ত জানতে দেয়া হয় না। আমাদেরকে বলা হয়— তার নাম বলা হারাম। সে জাস্ট অপরিচিত একজন বোন। এভাবে কারো নাম পর্যন্ত নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে! অথচ সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জয়নব (রা.) দরজায় কড়া নাড়ছিলেন। আয়েশা (রা.) বললেন— 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), জয়নব দরজায় কড়া নাড়ছে।' তিনি জয়নবের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তিনি কিন্তু বলেননি, 'একজন বোন এসেছে।' নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন জয়নব? আমি তো অনেক জয়নবকেই চিনি। তুমি কোন জয়নবের কথা বলছো?' তখন আয়েশা (রা.) বুঝিয়ে বললেন যে তিনি কোন জয়নবের কথা বলছেন।

আমার কথা হলো, ইসলাম আমাদেরকে যতটা না কঠোর হতে বলে, আমরা তারচেয়েও বেশি কঠোর হয়ে যাচ্ছি। এর ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। এটি আমাদের অন্যতম একটি সমস্যা।

এ তো গেলো এক দিকের কথা। অন্যদিকে আরেকটি পক্ষ রয়েছে, যারা এসব বিষয়কে মোটেও পাত্তা দেয় না। আসলে আপনি যদি সবসময় সব বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখান, তাহলে কেউ না কেউ এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখাবেই। এ কারণে ইসলামের প্রায়োগিক ও বাস্তবসম্মত বোঝাপড়াই হলো এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়। আমি এটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

তাই নারী-পুরুষের ইন্টার‍্যাকশন প্রসঙ্গে কথা হলো— কর্মক্ষেত্রে সবসময় অবনত মস্তকে থাকা যে প্রায় অসম্ভব, তা আপনারা জানেন। তো আল্লাহ কোরআনে কী বলেছেন?

اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"আল্লাহকে ভয় করো, যতটুকু তোমাদের পক্ষে সম্ভব।" (সূরা তাগাবুন: ১৬)

সুতরাং, কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনে নারীর দিকে তাকাতে পারেন। কিন্তু তার দেহকে সৌন্দর্যের বস্তু মনে করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন না। তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করুন। একজন অমুসলিম মহিলার সাথে কীভাবে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হয়, তা এখানে উপস্থিত ভাইদের সকলেই জানেন। চটুলতা পরিহার করে নারীদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করুন। কারো খোলামেলা পোশাকের কারণে যদি আপনার মনোযোগ নষ্ট হয়, তাহলে তার দেহের সংশ্লিষ্ট অংশে তাকাবেন না। দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। যদিও এটি খুব কঠিন কাজ। তবে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখলেও সে যেন বুঝতে পারে যে আপনি তার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করছেন।

আমি এক বয়োজ্যেষ্ঠ বোনকে জানি, যিনি ৩৫ বছর আগে মুসলিম হয়েছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণ করার পেছনে একটি ঘটনা রয়েছে। একবার এক মুসলিম দেশ থেকে আগত এক যুবকের সাথে তার দেখা হয়। বোনটির বাড়ি ইংল্যান্ডে নয়, অন্য কোনো দেশে। যাইহোক, তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন। তার পরনে ছিল খোলামেলা পোশাক। তারপরও যুবকটি তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করছিল। কোনো প্রকার কুরুচিপূর্ণ ও চটুল কথাবার্তা বলছিল না। এতে মহিলা খুবই অবাক হয়ে ভাবছিলেন— আমি এত সুন্দরী! সবাই আমার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে, নানা ধরনের মন্তব্য করে। কিন্তু এই যুবক আমাকে এত সম্মান দিয়ে কথা বলছে! ব্যাপারটা কী? এক পর্যায়ে তিনি যুবককে প্রশ্নটি করেই ফেললেন। যুবক জবাব দিলেন— আমি মুসলমান। কোনো নারীর দিকে অপলক ও কামুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকতে আমাদেরকে

শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে তিনি খুবই অভিভূত হলেন। তারপর ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। বর্তমানে তিনি মুসলিম কমিউনিটিতে খুবই সক্রিয়।

‘নারীদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকো না’— আল্লাহর এই বাণীর তাৎপর্য আপনাকে বুঝতে হবে। তাই তাদের দিকে কামনা ও প্রেমভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকবেন না। আমরা যে রকম করপোরেট পরিবেশে সাধারণত কাজ করি, সেখানে যদি কামনা ও প্রেমভাব ছাড়া নারীদের দিকে তাকান, বিনা প্রয়োজনে না তাকান, শুধু প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই বলেন এবং সম্মানজনক আচরণ করেন; তাহলে আমি এতে কোনো সমস্যা দেখি না।

এ ব্যাপারে শরীয়তেও দৃষ্টান্ত রয়েছে। আয়েশার (রা.) ঘটনা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। একদিন তিনি মসজিদে বর্শা খেলা দেখছিলেন। তিনি পুরুষদের দিকে তাকিয়ে থাকায় মহানবী (সা.) কিছু মনে করেননি। কারণ, তিনি জানতেন আয়েশা (রা.) বিশেষ কোনো অনুভূতি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন না।

অতএব, ‘আল্লাহকে ভয় করুন, যতটুকু সম্ভব।’ মূল ব্যাপার হচ্ছে, আপনি আদবকায়দা ও শিষ্টাচার মেনে চলছেন কি না।

আর বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে হ্যান্ডশেক করাকে আমি নিরুৎসাহিত করবো। একে উৎসাহিত করা উচিত নয় বলেই মনে করি। হ্যান্ডশেক করাকে কমপক্ষে মাকরুহ বলা যায়। তাই একে নিরুৎসাহিত করা উচিত। এই রাস্তা খুলে দেয়া উচিত হবে না।

তবে শয়তানের প্ররোচনায় কাজটি যদি করেই ফেলেন, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিছু সদকা করে দিন। এ জন্য নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ লোক ভাবার দরকার নেই। এর ফলে আপনি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাননি। এরচেয়ে অনেক বড় বড় পাপও আছে। আমরা সকলেই পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছি। একটি পাপ যেন অন্যান্য ভালো কাজ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে না নেয়, সেই চেষ্টা করুন। এখন আবার ভাববেন না যে আমি একে হালাল বলছি। ভুল বুঝবেন না।

শেষ কথা হলো, এই দেশে হয়তো এমন অনেক কিছুই করতে হচ্ছে যা আপনার অপছন্দনীয়। আল্লাহ ঠিকই তা জানেন। অবশ্য, এই দেশে এমন কিছু ভালো কাজও করতে পারছেন, যা হয়তো অন্য কোনো দেশে করতে পারতেন না। তাই এখানকার ভালো-মন্দ উভয় দিকই বিবেচনায় রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য কঠিন সমস্যাগুলো সহজ করে দিন।

প্রশ্ন—৪
যোগ্য আলেম খুঁজে পাওয়ার উপায়

আপনি বলেছেন, সংস্কারের জন্য যোগ্য আলেমের সন্ধান পাওয়া জরুরি। এই দেশে তো যোগ্য আলেমের অভাব। এমতাবস্থায় আমাদের মতো সাধারণ মুসলমানদের করণীয় কী? আমরা কি অন্য দেশ থেকে ভালো মানের আলেম নিয়ে আসবো?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, সাধারণত আলেমগণ ও মাদ্রাসাগুলো গতানুগতিক ধ্যানধারণা পোষণ করে থাকে। বলাবাহুল্য, প্রচলিত ধ্যানধারণা যে কোনো পরিবর্তনের বিরোধী। এমতাবস্থায়, সংস্কারের জন্য আমরা যোগ্য নেতৃত্ব কীভাবে পেতে পারি?

উত্তর

একটি বিষয় বুঝার চেষ্টা করুন, রক্ষণশীল ধারার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। আমার বক্তব্যে স্পষ্টভাবেই বলেছি, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবগত। একটা পর্যায় পর্যন্ত চুপচাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এ কারণে তাদেরকে অসম্মান করা কারোরই উচিত হবে না। ইসলামকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসার পেছনে তাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

আমার কথা হলো, আমাদেরকে আরো সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ইসলামের যে কোনো প্রকার সংস্কার প্রচেষ্টা রক্ষণশীল ধারার ভেতর থেকেই উঠে আসা প্রয়োজন। কারণ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি নিজেই এর উদাহরণ। আমি তো একসময় রক্ষণশীল ধারারই একজন ছিলাম। পুরনো ভিডিওগুলোতে দেখবেন, আমি একসময় 'সাওব' এবং টুপি পরতাম। এখন তো সবকিছু বদলে গেছে।

যাইহোক, আমরা আশা করি কয়েকজন রক্ষণশীল আলেম এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসবেন। তবে কেউ আসতে না চাইলেও সমস্যা নেই। তাদের জন্য সেটাই ভালো। তাদেরকে বলয়ের বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করা উচিত হবে না।

এবার মূল কথায় আসা যাক। আমরা প্রায় সময় সমালোচনা করি যে অনেক আলেমের চিন্তাভাবনা সেকেলে, বাস্তবতার সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। এসব সমালোচনার কিছুটা ভিত্তি আছে বৈকি। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমাদের অধিকাংশ আলেমের এই অবস্থার পেছনের কারণ কী বলে আপনার ধারণা? এর কারণ হলো, আমাদের মেধাবী, শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তদের অধিকাংশই আলেম হতে আগ্রহী নয়। আমাদের যে সকল সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, তাদের কয়জন দারুল উলুম, আল আজহার কিংবা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছেন? বরং আমরা প্রায় সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিসিন, গণিত পড়তে নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাচ্ছি।

অথচ এক সময় আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সবচেয়ে সেরা ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা

ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে যেতো। আর বর্তমানের বাস্তবতা হলো কিছু মুসলিম দেশের সরকার ঠিক করে দিচ্ছে কে কোন বিষয়ে পড়বে। পরীক্ষায় কেউ যদি ৯০ শতাংশ নম্বর পায় তাহলে সে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারে। এভাবে ৮০ শতাংশ পেলে ইঞ্জিনিয়ারিং, আর ৭০ শতাংশ পেলে অ্যাকাউন্টিং পড়তে পারে। আর যদি ফেল করে তাহলে তার জন্য উপযুক্ত জায়গা হলো দ্বীনি শিক্ষা! এটিই হচ্ছে বাস্তবতা। আমি বানিয়ে বলছি না। আমি সেই দেশগুলোর নাম জানি, কিন্তু বলতে চাচ্ছি না। অনেক মুসলিম দেশে এটি আইনের মাধ্যমে করা না হলেও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা নির্ধারিত। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ— এসব দেশের সেরা মেধাবীরা সেরা সেরা স্কুল-কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায়।

ফলে যে মানুষগুলো আধুনিকতার সাথে সবচেয়ে কম পরিচিত তারাই আলেম হয়। ফলে তাদের চিন্তাভাবনাও বাস্তবতা থেকে বেশ দূরেই থেকে যায়। আলেমদের এই পরিস্থিতিতে যারা অবাক হয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে এই পরিস্থিতির জন্য কমবেশি দায়ী। তাই বলে ক্যারিয়ার ছেড়ে আলেম হওয়ার জন্য আপনাকে জোর করছি না। আমি বলছি, চলুন আমরা অন্তত আলোচনাটা শুরু করি।

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তিন-চারটি সন্তান দিয়ে থাকলে অন্তত একজনকে আলেম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন। আমাদের সামাজিক অবস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আলেমদেরকেও উৎসাহিত করা উচিত। এ জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের মানুষজনের আলেম হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যদি মনে করেন, নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর মানুষই কেবল আলেম হবে, তাহলে তাদের কাছ থেকে কীভাবে আপনি উচ্চমান প্রত্যাশা করেন?

এটি যে একটি জটিল সমস্যা, সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তাদেরকে দোষারোপ বা নিন্দা করে এর সমাধান করা যাবে না। বরং আমাদের প্রত্যেকে এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারলেই কেবল এর সমাধান হবে। আমি সবসময় বলি, আপনি আলেম হতে না পারলেও অন্তত অজ্ঞ থাকবেন না। কিছু না কিছু শিখতে থাকুন। বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করুন, লেকচার শুনুন। এতে করে হয়তো আলেম হয়ে যাবেন না, কিন্তু চলতি ইস্যুগুলো সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত থাকতে পারবেন। ইতিহাসের কিছু বেসিক কোর্স করে ইতিহাসবিদ হতে না পারলেও দুনিয়ার চলমান ঘটনা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়। একইভাবে ইসলাম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করলে হয়তো আলেম হতে পারবেন না, তবে সত্যিকারের আলেমদের চিনতে পারবেন, ইসলামের অন্যান্য ধারাগুলো বুঝতে পারবেন।

আসলে এটি এমন এক সমস্যা, যার সহজ কোনো সমাধান আমার জানা নেই। আমার এভাবে কথা বলার এটি একটি কারণ। আমার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে—

কোনো বিষয়ে এভাবে কথা বলে আপনি মানুষকে শুধু শুধু বিভ্রান্ত করেন। জবাবে আমি বলি, এভাবে কথা বলাটাই একমাত্র উপায়। আল্লাহ চাহে তো এর মাধ্যমেই আমাদের আলোচনা এগিয়ে যাবে। এসব আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই আপনার মধ্যে সন্তানকে আলেম বানানোর প্রকৃত আগ্রহ তৈরি হবে, যারা বাস্তবতাকে বুঝবে। এভাবে আপনি বিদ্যমান প্যারাডাইমের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন।

কিন্তু তা তো বেশ দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। আপনি জানতে চাইতে পারেন— এই মুহূর্তে আমার করণীয় কী?

প্রথমত, আমার মনে হয়, আপনি ব্রিটিশ আলেমদের পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করতে চাচ্ছেন না। ব্রিটেনে কোনো আলেম নেই— এ ধরনের কথার সাথে আমি একমত নই। তবে আমি কারো নাম বলতে চাই না। কারণ, কারো কারো নাম বাদ পড়ে গেলে লোকজনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হবে। ব্রিটেনে যারা আছেন, তারা অনেক যোগ্য আলেম বলে আমি মনে করি। তারা আপনাদের সমাজেরই অংশ। তারা ইতোমধ্যে তাদের পাণ্ডিত্য, যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি সবসময় বলি, জ্ঞানের জন্য বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা জরুরি নয়। একটি ফতোয়ার জন্য টিম্বাকটু কিংবা কোনো দূরদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এমন কারো কাছে যান, যিনি আধুনিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত, যিনি আপনাদের মাঝেই বাস করেন। এ ধরনের আলেম বুঝতে পারবেন যে কিছু কিছু ফতোয়া এ দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। খুঁজলে এ দেশেই এ ধরনের আলেম পাবেন।

তাই আমি আপনাদের এই অভিযোগের ব্যাপারে একমত নই যে 'আমাদের কোনো আলেম নেই। তাই আমাদেরকে বাইরে যেতে হবে।' ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে এই লন্ডনেই সবচেয়ে বেশি আলেম রয়েছেন। মদীনা ও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করা আলেমদের কথা যদি বলেন, তাহলে লন্ডনেই সবচেয়ে বেশি আলেম পাবেন। কারণ, আপনারা সবাইকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। অনেকে তো একে 'লন্ডনিস্তান' বলা শুরু করেছে। আপনাদের এখানেই অনেক আলেম বসবাস করেন। কিন্তু তারা যে আলেম শ্রেণীর মানুষ, সেটি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। আশেপাশে জিজ্ঞেস করুন, কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবেন। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদে আপনার করণীয় হলো পালাবদলের ক্ষেত্র ও মাত্রা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা। আপনাকে কিছুটা হলেও ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। অজ্ঞ থাকবেন না। ফিকাহ, ধর্মতত্ত্ব ও তাফসীর সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা করুন। তাহলে বাস্তবতার সাথে মানিয়ে চলতে পারবেন এবং পরিবার ও এলাকার মসজিদে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরতে পারবেন।

এভাবেই একটি সচেতন নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। আমাদের হাতে কোনো জাদুকরী সমাধান নেই। তবে ধীরে হলেও পরিবর্তন আসবে।

প্রশ্ন—৫
ইসলামের খেদমত করার জন্য কি আলেম হতেই হবে?

আলেমগণ যদি যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং উপযুক্ত হন, তাহলে বর্তমান সময়ের নানাবিধ সমস্যা ও বাধা মোকাবেলায় তারা সক্ষম হবেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার সর্বাধিক জরুরি নয় কি?

উত্তর

শিক্ষাকেই সংস্কারের একমাত্র জায়গা বলে আমি মনে করি না। সংস্কারের আরো ক্ষেত্র নিশ্চয় রয়েছে। ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো-মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। একইভাবে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোরও ভালো-মন্দ রয়েছে। আমি দুই ধারার প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা করেছি। পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর ডিগ্রি নিয়েছি, কলা ও মানববিদ্যায় পড়েছি। আবার মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর পড়াশোনা করেছি। সেখান থেকে পিএইচডি করেছি। সব মিলিয়ে টানা ২২ বছর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিশ্বাস করুন, এর ফলে দুটি ব্যাচেলর, তিনটি মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রিই করিনি শুধু; উভয় ব্যবস্থা থেকেই ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছি। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে পশ্চিমা বিশ্বে একটি প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপন করার যে স্বপ্ন দেখি, তার পেছনে এই উপলব্ধিও একটি কারণ। সেই কলেজে আমরা আলেমদেরকে প্রশিক্ষণ দেবো। যেন তারা অগ্রগামী চিন্তাভাবনা করতে পারেন। যেন তারা রাজনীতি, মিডিয়া এবং সমাজে আরো গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারেন।

সংস্কার আমাদের জন্য জরুরি। তবে এই দেশের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার আগে হওয়া দরকার। এখানে এক ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম। তাকে বললাম, আপনি আলেমদের অবস্থা নিয়ে ভাবছেন। ভালো কথা। কিন্তু আপনার নিজের খবর কী? ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কী করছেন? আপনার জীবনের ভিশন কী? মসজিদ, কমিউনিটি, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপারে আপনার পরিকল্পনা কী? ব্যক্তি পর্যায়ে এগুলোই হচ্ছে আপনার জন্য সংস্কারের ক্ষেত্র।

আপনি নিজেও এই দেশ ও সংস্কৃতির অংশ— এই ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে হবে। ‘আমরা’ বনাম ‘তারা’ মানসিকতা থাকা উচিত নয়। আপনার মন মতো এমন কোনো দেশ নেই, এই দেশ ছেড়ে যেখানে গিয়ে বাস করতে পারবেন। বিশেষত, যারা এখানে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন, তারা অন্য কোথাও গিয়ে এখানকার মতো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবেন না। এই দেশে বসবাস মানেই অন্যায় নয়।

মনের মধ্যে এ ধরনের অপরাধবোধ থাকলে তা ঝেড়ে ফেলুন। এটি ঠিক, এ দেশের বেশিরভাগ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে এসব নীতি পরিবর্তনের জন্য ভেতর থেকে আপনিই সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন। জনমত, মিডিয়া বা এ জাতীয় অভ্যন্তরীণ বিষয় বাইরের কারো পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

আর দাওয়াতী কাজ তথা মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার ক্ষেত্রেও এখানে স্বাধীনতা রয়েছে। তাই শুধু নেতিবাচক বিষয়গুলো দেখা উচিত নয়। এগুলো আমাদের জন্য তেমন কোনো সমস্যা নয়। অবশ্য মুসলমানদের ব্যাপারে একটি বাস্তব অভিযোগ হচ্ছে— তারা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব খুব ভালোবাসে এবং অন্যকে দোষারোপ করতে পছন্দ করে। এটি আসলেই একটি সমস্যা। এটি মহানবীর (সা.) সুন্নত নয়।

মনে রাখতে হবে, ইলুমিনাতিরা দুনিয়া চালায় না। মসজিদে হারাম তথা কাবাঘরের মতো তাদের কোনো কেন্দ্র নেই, যার অদৃশ্য সুতার টানে সবাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিজগতের পরিচালক। অন্য কেউ নয়। হ্যাঁ, তারা শক্তিশালী বটে। কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিক বা এ রকম কোনো কিছুর মাধ্যমে তারা শক্তিশালী হয়নি। অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমেই হয়েছে।

কিন্তু সত্য সবসময় ক্ষমতার উপর জয় লাভ করে। মুসা (আ.) থেকে শুরু করে ইসলামের সকল নবী-রাসূলের জীবনীর উপর আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাই, সত্য সর্বদা মিথ্যার উপর জয় লাভ করেছে। তাই নিজের কাজে মনোযোগ দিন। কোনো অযুহাত দেখাবেন না।

এখনো অনেক কিছুই করার বাকি আছে। আপনাদের প্রত্যেকের সংস্কার কাজ শুরু হওয়া উচিত নিজের জীবনে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন— নিজের, পরিবারের এবং কমিউনিটির ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য আমার ভিশন কী? দুনিয়া পাল্টে দেয়ার ভিশন থাকার দরকার নেই। ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে তুমি কী দায়িত্ব পালন করেছো?— আল্লাহ আপনাকে এই প্রশ্ন করবেন না। তবে চাইলেই আপনার মসজিদের জন্য কিছু গঠনমূলক কাজ আপনি করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদেরকে নামাজের জন্য উৎসাহ দিতে পারেন। ইবাদতমুখী, কর্মনিষ্ঠ ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির মাধ্যমে তাদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারেন। ঘনিষ্ট বন্ধুমহলের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ শুরু করতে পারেন। সবাই যদি অমুসলিম প্রতিবেশী ও সহকর্মীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে, তাহলে কী ঘটবে ভাবতে পারছেন? নিশ্চয় এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আলেম না হলে ইসলামের জন্য কাজ করা যায় না— এমনটা ভাববেন না। হ্যাঁ, এটি

ভালো একটি উপায় বটে। কিন্তু সবাই আলেম হয়ে গেলে দুনিয়া চলবে কীভাবে? সাহাবীদের সবাই তো আলেম ছিলেন না। আবু হুরায়রা (রা.) আলেম ছিলেন, কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ছিলেন না। কোরআন-হাদীসের বিশেষায়িত জ্ঞান তাঁর ছিল না। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.), ওসমান ইবনে আফফানের (রা.) ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। ওসমান (রা.) আর্থিক সহায়তা করার দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন। তখন আমাদের জন্য ওসমানের (রা.) মতো সফল ব্যবসায়ীর প্রয়োজন ছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা আর্থিকভাবে অনেক কিছু করার সামর্থ্য তাঁকে দিয়েছিলেন।

তাই আমি মনে করি, আপনাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। নিজের সামর্থ্যকে ছোট করে দেখবেন না। আপনার কাজে আপনার বিকল্প কেউ নেই। আপনার বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীসহ যারা এখানে অনুপস্থিত, তাদেরকে আপনিই প্রভাবিত করতে পারবেন। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আপনার কাজটা অন্য কেউ করে দিবে না। তাই আল্লাহ আপনাকে যে মেধা, দক্ষতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং উদ্যম দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আপনার নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই যদি যার যার দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে। পরিবার, সহকর্মী ও সর্বোপরি নিজের জন্য একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাওয়াই আপনার কাজ। তাহলেই ইনশাআল্লাহ, শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন— হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেসব নেয়ামত দিয়েছেন, সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এর ফলেই আপনি জান্নাতুল ফেরদাউস পেয়ে যেতে পারেন। এটিই আমাদের দ্বীনের সৌন্দর্য।

প্রশ্ন—৬
হিজাব ইস্যু

আপনি বলেছেন, কেউ যত বেশি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে, সে তত বেশি কোনঠাসা হয়ে পড়বে। পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি খুবই সত্য। কিন্তু একজন বোন শালীনতার দাবি পূরণ করতে গিয়ে হিজাব এবং নিকাব পরিধান করেন। তার দৃষ্টিতে এটি ফরজ। আমাদের প্রবীণদের মতেও নিকাব পরিধান করা উচিত। এমতাবস্থায় বৃটিশ সমাজের সাথে এটি কীভাবে মানিয়ে নেয়া যাবে?

উত্তর

আমি স্পষ্টভাবেই বলেছি, প্রচলিত সংস্কৃতির যেটুকুর ব্যাপারে শরীয়তের অনুমোদন রয়েছে, সেটুকু গ্রহণ করে নেয়াই উচিত। কিন্তু আমরা পানশালায় যাবো না, যদিও এটি সমাজের ডমিন্যান্ট কালচার। কারণ, শরীয়ত এটি অনুমোদন করে না। অর্থাৎ এ জায়গায় এসে আমাদের সীমারেখা টানতে হবে।

নারীদের মাথা ঢাকার প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। কোরআনে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে। এটি মধ্যযুগের কয়েকজন আলেমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাত্র নয়। কোরআনের এই স্পষ্ট বক্তব্যকে কেউ অস্বীকার করলে বুঝতে হবে যে তিনি আসলে সাধারণ আরবী ভাষাই বুঝেন না। কারণ, আরবীতে মাথা ঢাকার কাপড় বুঝাতে যে শব্দ রয়েছে, সেটাই আল্লাহ তায়ালা ব্যবহার করেছেন।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“তারা যেন তাদের বক্ষদেশের উপর মাথার উড়না ফেলে রাখে।” (সূরা নূর: ৩১)

অর্থাৎ, শব্দটি হচ্ছে ‘খুমুর’ বা ‘খিমার’, যাকে হিজাব বলা হয়। ‘খিমার’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে মাথা ঢেকে রাখার চাদর বা ওড়না (head scarf)। কোরআনে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই একজন নারীর ‘আওরা’ — মাথাও যার অন্তর্ভুক্ত — ঢেকে রাখার ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐক্যমত রয়েছে।

অন্যদিকে, এ ব্যাপারটাকেই আমরা আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বানিয়ে ফেলেছি। মাথা ঢেকে হিজাব পরিধান করলেই কিংবা দাড়ি রাখলেই কাউকে ভালো মুসলমান মনে করা রক্ষণশীলদের অন্যতম একটি সমস্যা। দুঃখজনকভাবে, অনেকেই অবচেতনভাবে এই মানসিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন। আমরা বাস্তব জীবনে এ বিষয়গুলোর আলোকে তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে বিচার করা শুরু করি। অথচ এগুলোকে যতটা অপরিহার্য মনে করা হয়, ততটা নয়। তারমানে এগুলোকে অগুরুত্বপূর্ণ বলছি না

মোটেও। কিন্তু এগুলো নামাজ আদায়ের মতো অপরিহার্য নয়। অনেক দাড়িওয়ালা ভাই আছেন, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না। আবার, অনেক বোন আছেন, যারা হিজাব না করলেও আখলাকের দিক থেকে ভালো। তারা গীবত করেন না, এটা সেটা করে বেড়ান না। হিজাব না করার চাইতেও গীবত করা বেশি গুনাহর কাজ। অথচ অনেক হিজাবী বোনই গীবত করে বেড়ান।

মূল কথা হচ্ছে, কিছু বাহ্যিক বিষয়ের আলোকে অন্যদের ধার্মিকতা পরিমাপের একটি সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। অথচ অনেক সময় দেখা যায়, সেগুলো আসলে বৈধ। বিরিয়ানী খাওয়া যদিও হালাল, কিন্তু এটি নিশ্চয় ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না ধরে নিয়েই বলছি— হিজাব পরিধান করা নিশ্চয় ওয়াজিব। কিন্তু হিজাবের বিধান আল্লাহ কখন নাযিল করেছিলেন? পঞ্চম হিজরীর শেষ দিকে। নামায, রোযা, যাকাত, উত্তরাধিকার, বিয়ে এবং তালাক সংক্রান্ত মৌলিক বিধানগুলো নাযিলের পরে নবুয়তের শেষ দিকে যেসব বিধান নাযিল হয়েছিল, তারমধ্যে একটি হলো হিজাব। এমনকি হিজাব সংক্রান্ত সূরা আহযাবের আয়াতটি আল্লাহ তায়ালা শেষ করেছেন এভাবে— "আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

অতএব, আমরা যে ধরনের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে বাস করছি, সেখানে যেসব বোন হিজাব করার কারণে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছেন, তাদের প্রতি আমার হৃদয় নিংড়ানো সহানুভূতি রয়েছে। তাদেরকে আমি বলবো— আল্লাহ চান যে আপনারা হিজাব পরিধান করুন। আমি কখনোই এই বিধান পরিবর্তনের কথা বলিনি বা বলবো না। তবে মুসলিম নারীদেরকে বলবো, শুধুমাত্র হেডস্কার্ফ পরতে না পারার কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমান হতে পারছেন না— এমনটা ভাববেন না।

আমাদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, ভাইদেরকে দাড়ি নিয়ে লজ্জা দেয়া। আমরা প্রায়শ বলে থাকি— ভাই, দাড়ি না থাকলে কিন্তু আমাদের ইসলামিক সেন্টারে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। সুবহানাল্লাহ! এভাবে আপনি ভালো কাজের দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন!

বড় কোনো গুনাহর কাজ করলে কারো পক্ষে ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত নয়— তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সেই ব্যক্তি কি কোনো ইসলামিক সেন্টারের সাথে সম্পৃক্তও থাকতে পারবে না! তাহলে কি পাপ কাজ ও উত্তম আমলের ফিল্টারে পাশ করতে পারলেই কেবল ইসলামিক সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে? না। যে কোনো ইসলামিক সেন্টারের দরজা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যই খোলা রাখা উচিত।

সভাপতিসহ মুখ্য দায়িত্ব পালনকারী সদস্যদের ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন হওয়া উচিত— এটি ঠিক আছে। কিন্তু সমাজসেবা, ফান্ড রাইজিং কিংবা ইসলামী সচেতনতামূলক

কর্মসূচিতে থাকতে চাইলেও কি এ রকম উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন হতে হবে? না। বরং কমিউনিটি ও ইসলামিক সেন্টারগুলোতে প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যই স্পেস থাকা জরুরি; কেউ হিজাব করুক বা না করুক, দাড়ি রাখুক বা না রাখুক।

হ্যাঁ, বোন, এটা ঠিক যে হিজাব পরিধানের কারণে বাস্তবিকই আপনি মনোযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। আমরা প্রগতিবাদী নই। এ ব্যাপারে বিদ্যমান সুস্পষ্ট দলীলকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। তবে হিজাবের ধরন, কালার এবং সামগ্রিকভাবে পোশাকের স্টাইল ইত্যাদি শরীয়ত ঠিক করে দেয় না। তাই আমাদের সৃজনশীল ও শিল্পানুরাগী প্র্যাকটিসিং মুসলিম বোনেরা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন। আপনারা হিজাবের এমন ডিজাইনের কথা ভাবুন, যা একইসাথে শালীন এবং এখানকার সংস্কৃতি ও ড্রেসকোডের সাথে মানানসই হবে।

একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। পাকিস্তানী বোনেরা সাধারণত খুব ঢিলেঢালা সালোয়ার-কামিজ পরে থাকেন। সাথে বড় শাল গায়ে দেন। আবার, মালয়েশিয়ান বোনেরা বেশ উজ্জ্বল রংয়ের হিজাব পরিধান করেন। তাদের হিজাবে চমৎকার কারুকাজ থাকে। তারা এতেই অভ্যস্ত। অন্যদিকে, নাইজেরিয়ান বোনদের হিজাবের নকশা বেশ জটিল। তাদের হিজাবও যথেষ্ট শালীন।

মূল কথা হলো, পোশাকটি শালীন কি না, তা খেয়াল রাখতে হবে। আঁটোসাঁটো পোশাক পরা উচিত নয়। অবশ্য আমরা সবাই তা বুঝি। এটি হতে পারে মার্জিত কোনো টু-পিস পোশাক, যেমন বিজনেস স্যুট। তবে সেটি অবশ্যই ঢিলেঢালা হতে হবে, আঁটোসাঁটো হওয়া যাবে না।

আর কেউ যদি জিলবাব পরতে চায়, তাহলে তো কথাই নেই। মূল পোশাকের উপরে বাড়তি যে পোশাক পরা হয়, আরবীতে তাকে জিলবাব বলে। কিন্তু আমার মতে, জিলবাব পরাটা বাধ্যতামূলক নয়। এটি পরতে কেবল উৎসাহিত করা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়। এটিকে উৎসাহিত করার কারণ হচ্ছে, জিলবাব শব্দটা কোরআনের পরিভাষা। ‘লিসানুল আরাবিয়্যাসহ আরবী ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থে জিলবাব শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ খেয়াল করলে দেখবেন— জিলবাব হচ্ছে কোনো বড় আচ্ছাদন, যা নারীরা পরিধান করে। কেউ যদি বড় হেডস্কার্ফ পরে, তাহলে সেটাও জিলবাব হিসেবে বিবেচিত হবে। জিলবাব অবশ্যই উত্তম। আমাদের যেসব বোন জিলবাব পরেন, তাদের জন্য সেটাই ভালো। যারা হিজাব করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করি। আমরা তাদেরকে বলবো— শুরু করে দিন। আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু জিলবাব পরতে চেষ্টা করুন।

পরে আমার কথাকে ভুলভাবে উদ্বৃত করবেন না। তাই আরেকটু ভেঙে বলি— কোনো

বোন হয়তো হেডস্কার্ফ পরেন; কিন্তু একইসাথে আঁটোসাঁটো শার্ট ও জিন্স প্যান্ট পরিধান করেন। তিনি আসলে হিজাব থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। অন্যদিকে, কোনো বোন হয়তো মাথা ঢাকেন না, কিন্তু ঢিলেঢালা পোশাক পরেন। হিজাবের উদ্দেশ্যের দিক তিনি আগের জন থেকে কাছাকাছি রয়েছেন। আমরা অনেকেই আসলে বুঝি না হিজাব বলতে কী বুঝায়? হেডস্কার্ফ পরাকেই অনেকে হিজাব মনে করেন। এটি আমাদের একটি সমস্যা।

আবারো বলছি, আমাকে ভুলভাবে উদ্বৃত করবেন না। মাথা খোলা রাখাকে আমি হালাল বলিনি। আমি বলতে চেয়েছি, যে বোনটি হেডস্কার্ফ পরলেও আঁটোসাঁটো জিন্স প্যান্ট ও শার্ট পরেন (দুঃখজনকভাবে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে এই প্রবণতা বেশি), তার তুলনায় মাথা না ঢাকলেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখার মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা হিজাবের আদর্শ রূপের বেশি কাছাকাছি। আঁটোসাঁটো পোশাক পরলে আর মাথা ঢেকে রেখে লাভ কী? তাই বলেছি, শুধু মাথা ঢাকার চেয়ে ঢিলেঢালা পোশাক পরা হিজাবের অধিকতর নিকটবর্তী।

যাইহোক, যে বোনেরা হিজাবে পুরোপুরি অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন তাদেরকে বলবো, আপনারা এগিয়ে যান। হাত-পা ঢাকা ও ঢিলেঢালা পোশাক দিয়ে শুরু করুন। ইনশাআল্লাহ, ধীরে ধীরে মাথা ঢেকে চলার ব্যাপারেও হয়তো অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। তারপর জিলবাব পরতে চাইলে তো আরো ভালো। যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়।

মোট কথা, আমরা বোনদের উৎসাহিত করতে চাই। আর এ ধরনের কথাবার্তা তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেয়ে উৎসাহিত করবে বলেই আমি মনে করি।

আর ভাইদেরকে বলছি, আপনাদের ব্যাপারটা আরো সহজ। কারণ, দাড়ি থাকলেও আপনি সহজেই আর দশজনের মাঝে মিশে যেতে পারেন। কিন্তু আশি-নব্বইয়ের দশকে ব্যাপারটা কঠিন ছিল। এখন তো কারো মুখে দাড়ি আর চোখে সানগ্লাস থাকলে তাকে বেশ স্মার্ট ও সুপুরুষ বলে মনে করা হয়। তাই এখন কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না।

কিন্তু আমাদের বোনেরা আসলেই অনেক ভোগান্তিতে পড়েন। এক্ষেত্রে হিজাবী বোনদের তারিফ করতেই হয়। আপনারাই আমাদের ঈমানী অ্যাম্বাসাডর। আমরা দাড়ি রেখেও সহজে লোকজনের সাথে চলতে পারি। কেউ আমাদের মুসলিম হিসেবে চিনতে পারলেও তাদের সাথে আমাদের পোশাকের মিল দেখে হয়তোবা কিছুটা স্বস্তিবোধ করে। কিন্তু বোনদের বেলায় এমনটা সচরাচর ঘটে না।

তাই বোনদেরকে সম্মান করা উচিত। এমনকি যারা হিজাব পরে না, তাদেরকেও সম্মান করা উচিত। হিজাবের জন্য এখানে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। তাই তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত মন্তব্য করে বসবেন না। কোনো বোন যদি যথাযথভাবে পোশাক না

পরেন, তাহলে এ ব্যাপারে তার সাথে অন্য কোনো বোনকেই কথা বলতে দিন। তারাই ব্যাপারটার সমাধান করুক। তাদের ব্যাপারে মতামত দেয়া আপনার কাজ নয়। কিংবা 'তিনি কেন এটি করছেন না' ধরনের চিন্তা করাও আপনার কাজ নয়। বাস্তবতা হচ্ছে তিনি মসজিদে কিংবা কোনো ইসলামিক সেন্টারে আসছেন। ইংল্যান্ড বা আমেরিকার মতো দেশে বাস করে তিনি এসব জায়গায় আসার প্রয়োজনবোধ নাও করতে পারতেন। কিন্তু এই আধুনিক সমাজে বাস করেও তো তিনি আসছেন। তাই তিনি যেমন পোশাক পরেই আসুন না কেন, ফিরিয়ে দেবেন না।

আর যে বোনেরা ব্যাপারটা সামাল দেবেন, তারা খুবই ভদ্রভাবে তা করবেন। নতুন কোনো বোনকে যদি বলেন— 'কেন তুমি এ ধরনের পোশাক পরে এসেছো?' তাহলে তা ভদ্র আচরণ হবে না। আপনি বরং হাসি মুখে সালাম দিয়ে তাকে বলতে পারেন— 'বোন, তোমার নাম কি?' 'আমি ফাতেমা। আপনি?' এভাবে কথাচ্ছলে তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। ৫/১০ বার দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে ঘনিষ্টতা হওয়ার পর হিজাব নিয়ে কথা বলুন। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই যদি কঠোর ও বাজে আচরণ করেন, তাহলে কীভাবে তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করবেন? আসলে সবকিছুই নির্ভর করে আমাদের মানসিকতার উপর।

টিকে থাকা নিয়ে আমরা এখন চিন্তিত বটে। তাই বলে কঠোর ও কর্কশ আচরণ ইসলামসম্মত হয়ে যাবে না। বিশেষত যেখানে আমরা সংখ্যালঘু এবং তরুণ প্রজন্মের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগের পরিস্থিতিতে কঠোর ও আল্ট্রা-ইসলামিক হওয়া আমাদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে এই ইস্যুর সমাধান কীভাবে করা যায়, সে ব্যাপারে কথা বলতে আমি আগ্রহী।

আমার আগের কথা থেকে এটি পরিষ্কার যে বোনদের মাথা ঢাকার ব্যাপারটি কোরআনেরই বিধান। আমরা তা পরিবর্তন করতে পারি না। তাহলে আমরা কী করতে পারি? আগেই বলেছি, উগ্র এবং আঁটোসাঁটো না হওয়ার শর্তে আপনি পোশাকের স্টাইল, প্যাটার্ন ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারেন। বাজারের বেশিরভাগ হিজাবই মার্জিত। আপনারা সেগুলো পরতে পারেন।

বোনদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই। হিজাবের ফ্যাশন বা এ জাতীয় ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনাদেরকেই ভাবতে হবে। ফ্যাশন বলতে আমি পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে বুঝাচ্ছি না। বরং শরীয়তের শর্ত বজায় রেখে প্রচলিত সংস্কৃতি থেকে যথাসম্ভব গ্রহণ করার কথা বলছি। আলহামদুলিল্লাহ, এ ধরনের বেশকিছু ভালো ডিজাইন আমি দেখেছি।

বোনদেরকে সর্বশেষ বলবো, পোশাকের ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় আপনাদের জন্য শর্ত বেশি থাকায় প্রতিদানও বেশি পাবেন। কারণ, ভাইদের তুলনায় আপনারা বেশি কষ্ট করছেন। মহান আল্লাহ আপনাদেরকে তওফিক ও উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন।

সমাপনী বক্তব্য

উপস্থাপক: আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। সমাপনী বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে আজকের আলোচনা শেষ করার অনুরোধ করছি।

ইয়াসির ক্বাদী: বিশেষ কোনো সমাপনী বক্তব্য নেই। শুধু এ কথাটি বলতে চাই, আমরা খুবই কঠিন ও সংকটময় একটি সময়ে বাস করছি। এই সময়টাতে বিশ্বজুড়ে ও স্থানীয়ভাবে, এমনকি আপনার নিজের কমিউনিটিতেও প্রতিনিয়ত অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। মুসলমানদের ব্যাপারে সরকারগুলোর কথাবার্তা যথেষ্ট আশংকাজনক হয়ে ওঠছে।

তাই নিজেকে খোলসে লুকিয়ে রাখার সময় এখন নয়। বরং একজন গর্বিত মুসলমান হিসেবে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা করার সময় এখন। নিজের পরিবার, পরিচিত মহল, বন্ধুবান্ধব ও কমিউনিটির মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা করা দরকার।

ঠিক এ কারণেই আমি এই ইস্যুটি নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহী হয়েছি। এ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাকে আমি আরো এগিয়ে নিতে চাই।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকেই কেবল সফলতা আসে। তাই আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তাঁর সাথে সম্পর্ক না থাকলে কোনো কিছুই সফল হবে না। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
CSCS